তিন গোয়েন্দা

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

শ্বাপদের চোখ

রকিব হাসান

কিশোরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ট্রিশ।
নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর হাসি।
ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে কিশোর। কিন্তু পারছে না।
ট্রিশের চোখের দৃষ্টি আটকে রেখেছে ওকে।
এত লম্বা লাগছে কেন ট্রিশকে?
কেন লম্বা লাগছে, বুঝতে পারল।
অবিশ্বাস্য!
কিন্তু বাস্তব!
মেঝের ফুটখানেক ওপরে খাড়া হয়ে ভেসে রয়েছে
ট্রিশ। হঠাৎ তীব্র এক ঝলক আলোর রশ্মি
বিদ্যুৎ শিখার মত ছুটে এল কিশোরের দিকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

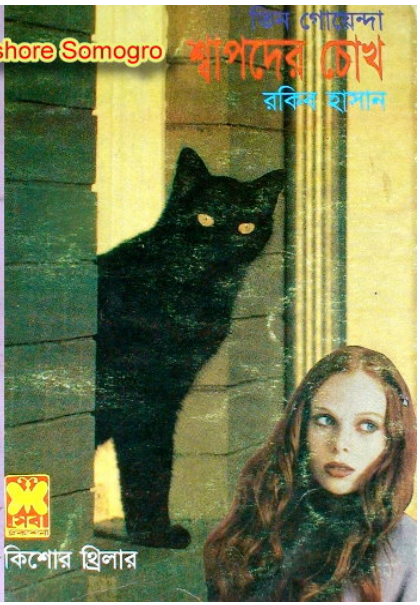

শ্বাপদের চোখ

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

বিছানায় গড়িয়ে চিত হলো কিশোর। চোখ মেলল। হাত-পা টানটান করতে লাগল ধীরে ধীরে।

ঘাড় ঘোরাল। বিছানার পাশের ঘড়িতে সময় দেখার জন্যে। এখন উঠে পড়লে খানিক ব্যায়াম করে এসে সময়মত স্কুলে পৌঁছানো যাবে কিনা দেখতে চায়।

আরি! চোখ মিটমিট করতে লাগল সে। টেবিলটা নেই ওখানে। এটা তার নিজের বাড়ির বেডরুম নয়।

দ্রুত, অস্থির ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল চোখ দুটো। ছাতের রঙ ধূসর। কেমন বিষণ্ণতায় ভরা। মনে পড়ল, কোথায় রয়েছে সে।

কি কি ঘটেছিল, মনে পড়ল সব।

চেপে ধরল গায়ে দেয়ার চাদরটার কিনার। একটানে তুলে নিয়ে এসে টেনে দিল মাথার ওপর। গুটি পাকিয়ে গোল হয়ে গেল বলের মত। চুলোয় যাক এই দুনিয়া, মানুষ-জন, সব কিছু। জাহান্নামে যাক।

চাদরের নিচেও চুইয়ে এসে ঢুকছে অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। কিশোরের মনে হলো এই গন্ধ যেন চিরকালের মত তার নাকে বসে গেছে, কোনদিন সরবে না আর।

বিছানার ধাতব স্প্রিঙের শব্দ হতে লাগল। ঘরের অন্য ছেলেগুলোও বিছানা ছাড়তে শুরু করেছে।

'গুড-মর্নিং, পাগলের গোষ্ঠী!' আপনমনেই হেসে উঠল সে। তিক্ত হাসি।

চটাৎ! চটাৎ! চটাৎ!

শব্দটা কিশোরের চেনা হয়ে গেছে। মোজাইক করা মেঝেতে শক্ত চামড়ার স্যান্ডেল পরে হাঁটছে গার্ড। ও রকম শব্দ এখানে একমাত্র গার্ডরাই করে। বাকি সবাই নরম ধূসর স্যান্ডেল পরে। যেগুলো পরে হাঁটলে কোন শব্দই হয় না প্রায়। হাসপাতালের এই 'মানসিক রোগী' লেখা উইংটাতে শক্ত বা ধারাল কোন জিনিস ব্যবহারের অনুমতি নেই রোগীদের। এমনকি জুতো পরাও নিষেধ।

রুক্ষ চেহারার বদমেজাজী মানুষগুলো গার্ড হলেও ওদেরকে 'গার্ড' বলে ডাকার নিয়ম নেই এখানে।

ডাকতে হবে ব্রাদার গ্রেগ, ব্রাদার লিওন, অর্থাৎ নামের আগে 'ব্রাদার'

শব্দটা যুক্ত করে দিয়ে।

কিন্তু কিশোরকে বাধ্য করতে পারেনি ওরা। সে 'গার্ড' বলেই ডাকে।

'অ্যাই, কিশোর, ওঠো!' বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল ব্রাদার গ্রেগ বিশালদেহী কুস্তিগীরের মত শরীর। মাথার লম্বা চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। কুতকুতে চোখ।

কিশোর জানে এই ডাক উপেক্ষা করা যাবে না। চাদরটা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠতেই হবে তাকে। এই জেল হাসপাতালের আইন বড় কড়া।

বিছানার পাশে দেয়ালে লাগানো ফ্রেমে ঝোলানো রয়েছে রঙ চটা, মলিন একটা তোয়ালে। উঠে বসে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলে আনল সেটা। বিছানা থেকে নেমে জেল হাসপাতালের সরবরাহ করা ধূসর রবারের স্যান্ডেল পায়ে গলাল। তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে দু'হাতে ডলে ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল চোখ থেকে। পরনে হাসপাতালের দেয়া ঢোলা পোশাক।

'লাইনে দাঁড়াও,' আদেশের সুরে প্রায় ধমকে উঠল ব্রাদার গ্রেগ। দরজার বাইরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ছেলেরা। ধূসর হলঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরও দাঁড়িয়ে গেল সারিতে। বাথরুমে যাওয়ার জন্যে।

সারির সঙ্গে শামুকের গতিতে চলতে চলতে পাশের জানালার দিকে তাকাল সে। মোটা শিক লাগানো জানালার ওপাশে কাঁচের শার্সি। তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। কাঁচের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বালতিতে করে পানি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে কাঁচের গায়ে। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। চমকে গেল কিশোর।

ইস্, যদি বেরিয়ে যেতে পারতাম! মনটা আকুলিবিকুলি করে উঠল তার। এখন বেরোলে মুহূর্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে যেতে হবে। শীতে কাঁটা দেবে গা। তবু তো স্বাধীনতা! আহা!

জঘন্য এই বন্দীশালা থেকে ওই ঝড়-বৃষ্টিও অনেক ভাল।

বাথরুমের দরজার মুখে পৌঁছে গেল সে। প্রতিবারে চারজন করে যেতে পারে ভেতরে। চারজনের ব্যবস্থা আছে। কিশোরের পালা এল। গোমড়ামুখো চারটে ছেলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল সে। ওরাও তার মতই পাগল। মানসিক রোগী।

আমাকেও নিশ্চয় ওদের মতই গোমড়ামুখো লাগছে। পাগল তো! ভাবল কিশোর। সব পাগলেরই চেহারার ভঙ্গি এক, তাকানো এক।

বাথরুমে খোলা বালব ঝুলছে ছাত থেকে। বেসিনের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুখে পানির ছিটে দিতে দিতে আয়নার দিকে তাকাল।

উঁহু, মোটেও ভাল না। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মন্তব্য করল সে। ধসে গেছে চেহারা। বড় বড় চোখ দুটোর নিচে কালি। চামড়ার রঙটা সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেয়ালের ধূসরতার সঙ্গে মিল আছে।

আর চুলেরই বা কি দশা! ছেঁটে ছোট করে দেয়া হয়েছে। সাবান-শ্যাম্পু, কোন কিছুই ঠিকমত দিতে না পারায় মাত্র তিনদিনেই কেমন বিবর্ণ,

মলিন লাগছে চুলগুলো।

তিন দিন। মাত্র তিন দিন এই দুঃস্বপ্নের জগতের বাসিন্দা হয়েছে সে। মনে হচ্ছে তিন যুগ।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। অভ্যস্ত হতে হবে। যে করেই হোক। মনে হচ্ছে না খুব সহসা ছাড়া পাবে। কতকাল থাকতে হবে কে জানে।

বিচারকের কথাগুলো কানে বাজছে। ওর চাচাকে বলছে, 'পাগল হোক আর যা-ই হোক, খুন করেছে আপনার ভাতিজা। খুন করা ভয়ানক অপরাধ। জামিন দেয়া যাবে না।'

'খুন করা ভয়ানক অপরাধ!' আয়নার দিকে তাকিয়ে আনমনে কথাটার প্রতিধ্বনি করল সে। একটা চিরুনি তুলে নিয়ে চুলে বসাল।

তার পাশের সিংকের ছেলেটা ঝট করে মুখ তুলে তাকাল।

ফিরে তাকাল না কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল। চমৎকার! নিজে নিজে কথা বলা শুরু করেছি তাহলে! ডাক্তারের কথাই বোধহয় ঠিক। এটাই তাহলে হওয়া উচিত আমার সঠিক বাসস্থান।

'জলদি করো না!' দরজার কাছ থেকে ধমকে উঠল ব্রাদার গ্রেগ। 'ডাক্তার সাহেব কি বসে থাকবেন নাকি তোমার জন্যে? বাথরুমেই যদি এতক্ষণ লাগিয়ে দাও, নাস্তা করবে কখন? ডাক্তারের কাছে যাবে কখন?'

ডাক্তার! ডক্টর মনরোর সঙ্গে আরেকবার সিটিং দেবার কথা মনে হতেই নিজের অজান্তে কুঁকড়ে গেল কিশোর। আগের দিনের কথা ভাবল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মাথা ধরে গিয়েছিল তার। অনন্ত জিজ্ঞাসা ডাক্তারের। কি হয়েছিল? কি ভাবছে? কেমন বোধ করছে? উফ্! ভয়াবহ!

গরিলার মত চেহারার ওই নাছোড়বান্দা লোকটার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর কথা বলতে চায় না সে। এত কথার দরকারটা কি? একটা নামই তো যথেষ্ট। ভয়াবহ এক পিশাচীর নাম। ট্রিশ অ্যান্ডারসন।

ট্রিশ!

দুই

গাড়িটা ড্রাইভওয়ে থেকে বের করছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা।

'বিদায়, রকি বীচ। ওশনসাইড, আসছি আমরা!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল গাড়ি। পেছনে তাকিয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে ওদের বাড়িটা।

ঝাড়া মেরে পা থেকে স্যান্ডেল খুলে নিয়ে আরাম করে পিঠ এলিয়ে দিল চেয়ারে। তার ডানে বসা বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে হাসল। মেরিচাচীর

ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে। মেরিচাচীর ভাই মিস্টার হোমার একজন সরকারী উকিল।

ফুফুর দায়িত্বে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রেখে ছুটিতে ইয়োরোপে বেড়াতে গেছেন ওদের বাবা-মা। ছেলেটার নাম এরিক বয়েস আট বছর মেয়েটা বেকি। বয়েস পাঁচ।

পচা গরম পড়েছে। মুহূর্তে ঘেমে আঠা হয়ে যায় শরীর।

'চাচা, এয়ারকুলারটা ছেড়ে দাও,' কিশোর বলল

'চালুই তো আছে,' মেরিচাচী জানালেন।

'কই, টের পাচ্ছি না তো,' গোঁ-গোঁ করে বলল এরিক

'আমি পাচ্ছি। আমার শীত লাগছে।' হি-হি করে কাঁপার ভঙ্গি করল বেকি। এরিক যা বলবে, সে ঠিক তার উল্টোটা বলবে।

হাইওয়ের এক ধারে গাছপালা। মাঠ। বাড়িঘর। আরেক পাশে প্রশান্ত মহাসাগর। সকালের চমৎকার সোনালি রোদ। আকাশে মেঘ নেই বলে সকালটা অতি সুন্দর।

বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দায়িত্ব দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভারের ওপর। কাজেই নিশ্চিন্ত রয়েছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী।

ইয়ার্ডের পুরানো মাল বেচাকেনার পাশাপাশি কিছুদিন হলো শখের সাংবাদিকতা শুরু করেছেন মেরিচাচী। একটা ম্যাগাজিনের জন্যে নতুন আর্টিক্যাল লিখছেন। তথ্য আর মালমশলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নামটা কি দেবেন তা-ও ঠিক করে ফেলেছেন: নতুন প্রজন্মের ওপর নতুন চাপ বর্তমান ইয়াং জেনারেশন যে মানসিক পীড়নের মধ্যে রয়েছে, লেখাটা তার ওপর ভিত্তি করে। ওশনসাইডে বসে শেষ করার ইচ্ছে।

হাইওয়ে ধরে ছুটছে গাড়ি। সামনের সীট থেকে ফিরে তাকালেন মেরিচাচী। 'কিশোর, বল্ তো, তোর জীবনে এখন সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ কোনটা?'

ইস্, আবার! নীরবে গুঙিয়ে উঠল সে। এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত মূড নেই এখন তার। খোদা! বাঁচাও!

বাতাসে উড়তে থাকা চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মেরিচাচী বললেন, 'আমি জানি তোর জীবনে অনেক সমস্যা। প্রচুর দুশ্চিন্তা। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা?' মাঝে মাঝে কিশোরের মনে হয়, ও যেন ওর চাচীর গবেষণার বস্তু। বস্তুর সঙ্গে তার তফাৎটা হলো, তার প্রাণ আছে।

'এই মুহূর্তে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, এ দুটোর পাশে বসে থাকা,' এরিক আর বেকিকে দেখিয়ে বলল কিশোর। মহাসুখে তখন বাক্স থেকে পেস্ট্রি বের করে খাচ্ছে দু'জনে। খাওয়ার চেয়ে বেশি করছে শয়তানি। পেস্ট্রির সমস্ত মাখন ডলে ডলে ভাইয়ের শার্টে লাগাচ্ছে বেকি।

'অ্যাই, ভাল হচ্ছে না কিন্তু!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

হি-হি করে হাসতে লাগল বেকি। পেস্ট্রি দিয়ে এরিকের চুলে ডলা মেরে

বলল, 'দে, আমি তোর চুল আঁচড়ে দিই।'

'থামবি!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল এরিক।

চাচীকে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'বুঝলে তো এখন?'

চেঁচানো শুরু করল এরিক। 'ফুফু, ওকে কিছু বলবে? শেষ করে দিল তো!'

আস্তে করে বেকির হাতটা সরিয়ে দিলেন মেরিচাচী। এরিকের শার্টে লাগা মাখন মুছতে হাত বাড়ালেন।

সীটের পেছনে রাখা একটা পাখির খাঁচা। কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এরিকের দিক থেকে মনোযোগ শেষ হতে ফিরে তাকাল বেকি। টান দিয়ে সরিয়ে নিল খাঁচার ওপরের কাপড়টা। ভেতরে দুটো মুনিয়া। মেয়েটা সারাক্ষণ মুখ ভার করে রাখে, বর্ষাকালের মেঘে ঢাকা আকাশের মত। কিশোরের ধারণা। তাই নাম রেখেছে ক্লাউড। আর পুরুষটা খালি মেজাজ দেখায়। সে-জন্যে ওটার নাম থান্ডার।

কাপড় সরাতেই কিচির-মিচির শুরু করে দিল পাখি দুটো। তাতে জেগে গেল মিস্টার ডেভিল। এতক্ষণ কিশোরের পায়ের কাছে আরাম করে ঘুমিয়ে ছিল। এগুলোও অ্যান্ডারসনদের সম্পত্তি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এগুলোকেও মেরিচাচীর দায়িত্বে রেখে গেছেন।

'উঠে পড়েছিস। আয়,' ভারী বিড়ালটাকে আদর করে তুলে নিয়ে কোলের ওপর বসাল কিশোর। জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করে ও। ওর হাত চেটে দিল বিড়ালটা। কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার শুয়ে পড়ল কোলের ওপর।

'কিশোর,' আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন মেরিচাচী, 'বল্ না, কোন ব্যাপারটা নিয়ে এখন তোর সবচেয়ে মানসিক যন্ত্রণা?'

ইস্, চাচীর হাত থেকে মুক্তি নেই! যতক্ষণ না একটা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে, ছাড়বে না চাচী।

'এখন সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছ তুমি,' রেগে উঠল কিশোর। 'ইস্, পাগল করে দিল!'

হাসিটা মিলিয়ে গেল মেরিচাচীর। বড় বড় চোখ দুটোর উজ্জ্বলতা থাকল না আর, নিস্প্রভ হয়ে গেল।

বলাটা কি ঠিক হলো? ভাবল কিশোর। 'পাগল হয়ে যাচ্ছি', 'পাগল করে দিল', এ ধরনের কথাগুলো শুনলেই ভড়কে যান মেরিচাচী। কারণ সত্যি সত্যি একবার মাথা গড়বড় হয়ে গিয়েছিল কিশোরের। ডক্টর মুনের ইনজেকশনের প্রভাবে। মুসা, রবিন, এমনকি চাচীকেও খুনের পরিকল্পনা (তিন গোয়েন্দা সিরিজের 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' বইতে) করেছিল তখন সে।

বলে যখন ফেলেছে, ফেলেছে, এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। মিস্টার ডেভিলের কানের গোড়া চুলকে দিতে লাগল কিশোর। ওশনসাইডে গিয়েও ছুটির পুরো স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না আর সে। সারাক্ষণ এখন তার ওপর কড়া নজর রাখতে থাকবেন মেরিচাচী।

কিশোর তাঁর মন খারাপ করে দিয়েছে। বাড়িয়ে দিয়েছে দুশ্চিন্তা। অন্য

প্রসঙ্গে চলে গেলেন মেরিচাচী। বেকি আর এরিককে দেখে রাখার জন্যে একজন বেবি-সিটারের প্রয়োজন। ওশনসাইড ডেইলিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি।

'কই,' রাশেদ পাশাকে বললেন তিনি, 'কেউ তো এল না। ওখানে গিয়ে কাউকে না পেলে তো বেড়ানোটারই বারোটা বেজে যাবে।'

'পেয়ে যাবে,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'অত চিন্তা কোরো না।'

চিন্তাটা যে মেরিচাচীর কোনখানে, সেটা তো কিশোর বুঝতে পারছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিল সে।

দুই ঘণ্টা পর ওশনসাইডে যাওয়ার রাস্তাটায় ঢুকল গাড়ি। হাইওয়ে থেকে মোড় নিয়ে সরু আঁকাবাঁকা আরেকটা রাস্তা ধরে আধঘণ্টা গাড়ি চালালেন রাশেদ পাশা।

ছোট্ট সৈকত শহর ওশনসাইড নজরে এল। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইল কিশোর। শহরে ঢুকল গাড়ি। আর্ট গ্যালারি, রেস্টুরেন্ট, স্পোর্টস স্টোর আর একটা পুরানো ধাঁচের জেনারেল স্টোর পার হয়ে এল।

'সুন্দর শহর,' বলল সে।

'কিশোর ভাই, ওই দেখো!' চিৎকার করে উঠল এরিক।

ট্রাফিক সার্কেলের ঠিক মাঝখানের গোল চত্বরে ঘাসে ঢাকা এক টুকরো জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা বাদামী ভালুকের প্রমাণ সাইজের মূর্তি। থাবায় চেপে ধরা একটা মাছ।

'শুনেছি,' রাশেদ পাশা বললেন, 'মাছ শিকার নাকি এখানে দারুণ জনপ্রিয়। তারমানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।'

চত্বরটার পাশ দিয়ে অন্যপাশে চলে এল গাড়ি। ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

'বাড়িটা কি পাহাড়ের ওপরে, চাচা?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'বাড়িটা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই নিচের সাগর দেখা যায়। খুব সুন্দর।'

গাছপালায় ঘেরা কতগুলো সামার হাউজের দিকে মোড় নিল অবশেষে গাড়ি। সরু একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়িটা। চেহারাটা আধুনিক, কিন্তু বাড়িটা পুরানো। কাঠের তৈরি। মরচে পড়া চালা।

'সত্যি সুন্দর!' মিস্টার ডেভিলকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল কিশোর।

হুড়াহুড়ি করে তার পেছনে নেমে এল এরিক আর বেকি। ছুটাছুটি শুরু করে দিল সামনের লনটায়।

বাড়ির সদর দরজার তালা খুললেন রাশেদ পাশা। পেছন পেছন ঘরে ঢুকল কিশোর। বলে উঠল, 'দারুণ!'

মুগ্ধ চোখে ঘরের জিনিসগুলো দেখতে লাগল সে। ওপরের দুটো স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে আধুনিক লিভিং রুমটাতে। পেছনের

দেয়ালের বেশির ভাগটা জুড়ে রয়েছে কাঁচের পাইডিং ডোর। নীল-সাদা ডোরাকাটা পর্দা দিয়ে ঢাকা দরজার দুটো ফ্রেমের দুই প্রান্ত।

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে কাঁচের পাইডিং ডোরটা ঠেলে সরিয়ে একটা কাঠের ডেকে বেরিয়ে এল। নিচে রোদে চকচক করছে সুইমিং পুলের পানি। গাছের ছায়া এসে পড়েছে পানিতে।

'দারুণ! দারুণ!' আবার একই কথা বলল কিশোর। সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার আর নতুন কোন শব্দ নেই যেন তার স্টকে।

কান পেতে রইল সে। কানে আসছে গাছের ফাঁকে বয়ে যাওয়া বাতাসের বিচিত্র শব্দ। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল।

অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে ঘরে ফিরে এল আবার সে। সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন রাশেদ পাশা। তাঁকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।

এরিক আর বেকি ছুটাছুটি করে খেলছে। এসে পড়ল তার গায়ের ওপর।

'এহ্হে,! চোখে দেখো না নাকি?' ধমক লাগাল কিশোর। কিন্তু এতই উত্তেজিত দু'জনে, ওর কথা কানেই ঢুকল না। ওদের খেলা ওরা চালিয়েই গেল।

চাচার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ট্রাংক থেকে একটা ব্যাগ বের করেছেন রাশেদ পাশা। হাত বাড়াল কিশোর, 'দাও, ওটা আমার কাছে।'

'বাড়ির মালিকের একটা বোটও ছিল, বুঝলি। ইঞ্জিন লাগানো,' রাশেদ পাশা বললেন। 'নদীর ঘাটে বাঁধা আছে। ওটা ফাও দিয়ে দিয়েছে বাড়ির সঙ্গে চালিয়ে দেখতে হবে ওটা।'

ব্যাগের ভারে কাত হয়ে গেল কিশোর। ঘরে এসে ঢুকল। সামনের হলের লাগোয়া ত্রিকোণ রান্নাঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল চাচীকে। কিশোরকে দেখে বললেন তিনি, 'খাবার তো কিচ্ছু নেই ঘরে। বাজারে যাওয়া দরকার।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' কিশোরের পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল বেকি। দৌড়ে গিয়ে ফুফুর শাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করল।

তাকে কোলে তুলে নিলেন মেরিচাচী, 'আচ্ছা, যেয়ো।'

'আমিও যাব,' লিভিং রুম থেকে চিৎকার করে উঠল এরিক। 'ওই ভালুকটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'আমি আর যাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'এ দুটোর সঙ্গে আরেকবার গাড়িতে বসার এক বিন্দু ইচ্ছে আমার নেই। আমি বাড়িতেই আছি।'

'ঠিক আছে, থাক,' বেকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মেরিচাচী। তিনি, এরিক আর রাশেদ পাশাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বললেন, 'জরুরী কোন দরকার

পড়লে ফোন করিস।'

'পড়বে না,' হাত নেড়ে জানিয়ে দিল কিশোর।

ডেকে উঠল পাখিগুলো। ফিরে তাকাল কিশোর। 'অ, রোদের মধ্যে যেতে চাইছিস?' এগিয়ে গিয়ে খাঁচাটা তুলে নিল সে। কাউচের পেছনে নিয়ে গিয়ে রাখল। জানালা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ওখানে। 'নে, এখানে তোদের ভাল লাগবে।'

যেন তার কথার জবাবে গান গাইতে শুরু করল পাখি দুটো।

ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ লেজ নাড়ানো শুরু করল মিস্টার ডেভিল।

'পাখির ওপর লোভ করলে পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব,' আলতো ধমক লাগাল কিশোর।

সুটকেস আর ক্যাসেট প্লেয়ার হাতে দোতলায় নিজের বেডরুমে এসে ঢুকল সে। সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করে বিছানায় রাখল। সেগুলো কেবিনেটের ড্রয়ারে গোছানোর আগে চালু করে দিল ক্যাসেট প্লেয়ারটা। গান শুনতে শুনতে গোছাবে। এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল।

কে এল?

সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচতলায় নেমে এল সে। দরজা খুলে দিল।

অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের চেয়ে দু'এক বছর বেশি হতে পারে বয়েস। চোখের মণি এত নীল, কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগানো কিনা ভাবল কিশোর। মাথা ভর্তি সোনালী চুল রেশমের মত ঝলমল করছে। হালকা নীল শার্ট আর সাদা প্যান্টে চমৎকার লাগছে।

'এই যে,' কিশোরকে দেখে বলে উঠল মেয়েটা। 'বিজ্ঞাপনটা দেখে এলাম।'

'বিজ্ঞাপন?'

'দুটো বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হবে, বলা হয়েছে না?'

'ও। ওই বিজ্ঞাপন!' একপাশে সরে জায়গা করে দিল কিশোর। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'আমি ট্রিশ,' ঘরে ঢুকে মেয়েটা জানাল। 'ট্রিশ অ্যান্ডারসন। আমাকে আপনি আপনি করতে হবে না। তোমার চেয়ে বয়েস খুব একটা বেশি হবে না আমার।...যা বলছিলাম। বিজ্ঞাপনটা পড়ে মনে হলো, আমার জন্যে খুব ভাল হবে।'

'তাই?' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমার চাচা-চাচী তো ঘরে নেই এখন।'

'অ,' দমে গেল মনে হলো ট্রিশ। 'আজকেই আরেকটা ইন্টারভিউ আছে আমার। একটার সময়। ওটা হয়ে গেলে আর আর আসব না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হাত তুলল কিশোর। 'ফোন করে দেখি। চাচী বলে গেছে, জরুরী দরকার হলে...'

থেমে গেল সে। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ট্রিশের। নীল চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে আছে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

তীক্ষ্ণ একটা হিসহিসানী শোনা গেল।

ঘুরে তাকাল কিশোর।

কাউচের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার ডেভিল। পরিবর্তন তার মাঝেও দেখা যাচ্ছে। একটা থাবা উদ্যত। বেরিয়ে পড়েছে থাবার নখগুলো। ভয়ানক ভঙ্গিতে ফাঁক করে রাখা মুখের ভেতরে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের চুল। আরেকবার হিসিয়ে উঠল সে।

'সরি,' ট্রিশকে বলল কিশোর। মিস্টার ডেভিলকে তুলে নিয়ে শান্ত করার জন্যে পিঠ চাপড়ে দিয়ে স্বগতোক্তি করল, 'কি রে, কি হয়েছে তোর? এ রকম ও তো কখনও করিস না!'

'আমি বরং চলেই যাই!' দরজার দিকে রওনা দিল ট্রিশ।

'আরে না না, দাঁড়াও!' শক্ত করে মিস্টার ডেভিলকে চেপে ধরল কিশোর। 'এক মিনিট। চাচীকে ফোন করে দেখি, কি বলে?'

হাতের দামী ঘড়িটা দেখল ট্রিশ। 'ঠিক আছে। তাহলে বসেই যাই কয়েক মিনিট।'

রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে করে মেঝেতে নামিয়ে রাখল মিস্টার ডেভিলকে। 'হলো কি তোর? খবরদার, আর শয়তানি করবি না।'

চাচীর মোবাইল নম্বরে ফোন করল কিশোর। ট্রিশের কথা জানাল।

'এখুনি রওনা হচ্ছি,' মেরিচাচী বললেন। 'ওকে আটকা। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমাদের।'

রিসিভার রেখে ঘুরে তাকাতেই চোখে পড়ল মিস্টার ডেভিলের লেজটা দরজার ওপাশে চলে যাচ্ছে। বসার ঘরে চলে যাচ্ছে সে।

'মিস্টার ডেভিল! মিস্টার ডেভিল!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'উফ্, নামও রেখেছে বটে! ডাকলে গলা শুকিয়ে ওঠে!'

আবার হিসিয়ে উঠল বিড়ালটা।

তারপর তীক্ষ্ণ একটা ভীতিকর শব্দ। বিড়ালের ক্রুদ্ধ ডাকের মতই, তবে কিছুটা অন্য রকম। বিড়ালকে কখনও এ রকম শব্দ করতে শোনেনি সে।

দরজার অন্যপাশে এসে ট্রিশের ওপর চোখ পড়তে বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর।

চিতাবাঘের আক্রমণের ভঙ্গিতে কাঁধ দুটো কুঁজো করে ফেলেছে ট্রিশ। আবার সরু হয়ে এসেছে চোখের পাতা। চোখের সাদা অংশটা হলুদ হয়ে গিয়ে ধক্‌ধক্ করছে।

আচমকা বিড়ালের মত ঠোঁট ওপরে তুলে ভেঙচি কাটল মিস্টার ডেভিলকে। হিসিয়ে উঠল।

শিউরে উঠল কিশোর। এ রকম ভীতিকর শব্দ জীবনে শোনেনি।

তিন

আরেকবার জন্তুর মত, অমানবিক একটা হিসহিস শব্দ করে উঠল ট্রিশ।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঝড়ের গতিতে গিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল মিস্টার ডেভিল।

ফিরে এসে নিচু হয়ে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিল কিশোর। গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। 'কেমন মজা? গেছিলি অন্যকে শাসাতে, এখন নিজেই কাবু।'

কিশোরের হাতে মাথা ঘষতে শুরু করল মিস্টার ডেভিল। ঘাড়ের লোম এখনও খাড়া।

'চাচী রওনা হয়ে গেছে,' দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ট্রিশকে বলল কিশোর। 'তুমি বসো।'

একটা বাটিতে করে মিস্টার ডেভিলকে পানি এনে দিল কিশোর। তাকে চাপড়ে দিয়ে, আদর করে বহু কষ্টে শান্ত করল। কয়েক মিনিট পর বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সদর দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চাচা-চাচী ট্রিশকে স্বাগত জানালেন। হুড়মুড় করে রান্নাঘরে এসে ঢুকল এরিক। পেছনে বেকি।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল এরিক, 'মহিলাটি কে? আমাদের নতুন বেবি-সিটার?'

খোলা দরজা দিয়ে লিভিং রুমের দিকে তাকিয়ে দেখল কিশোর, ট্রিশের ইন্টারভিউ নিতে বসেছেন চাচা-চাচী। এরিকের কথার জবাব দিল সে, 'রাখা হবে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'

তবে সহসাই বুঝে গেল কিশোর, পরিস্থিতি ট্রিশের পক্ষেই যাচ্ছে।

কাউচে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন রাশেদ পাশা। দুই হাত কোলের ওপর। চোখের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা দেখেই বোঝা যায় ট্রিশকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন তিনি।

পাশে বসেছেন মেরিচাচী। ট্রিশের কথা শুনে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে চাচা-চাচীর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তাঁদের ভাব-ভঙ্গিই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ট্রিশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছেন দু'জনেই।

'কিশোর ভাই, বাক্সটা খোলো না,' এরিক বলল। 'খিদে পেয়েছে খুব।'

চাচীর নিয়ে আসা মুদীর ব্যাগ খুলে টিউনার টিন খুলল কিশোর। এরিক আর বেকির জন্যে স্যান্ডউইচ বানাতে শুরু করল। একটা চোখ লিভিং রুমের দিকে।

'আরি, কিশোর ভাই, কোনদিকে তাকিয়ে আছ? সব পড়ে যাচ্ছে তো'

চেঁচিয়ে উঠল এরিক। একটা কাঠের টুল টেনে এনে তাতে উঠে বসল।

'পড়ুক, পড়ুক,' বেকি বলল। 'খারাপ জিনিসগুলোই পড়ছে। ইচ্ছে করেই ফেলছ, তাই না, কিশোর ভাই?'

'চুপ!' ধমক লাগাল কিশোর। 'শুনতে পাচ্ছি না তো।'

'শহরের বাইরে আমার দূর সম্পর্কের এক আন্টির কাছে থাকি,' ট্রিশ বলছে। 'আন্ট জিরার মেয়ে শীলা কলেজে পড়ে। হোস্টেলে থাকত। মা'র কাছে চলে এসেছে এখন। তিনজনের জন্যে বাড়িটা খুব ছোট হয়ে গেছে। থাকা-খাওয়া সহ একটা কাজ পেলে এখন সমস্যার সমাধান হয় আমার।'

'এ ধরনের কাজ কি আর করেছ কখনও?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'করেছি। গত দুই গ্রীষ্মেই বেবি-সিটারের কাজ করেছি।'

'বয়েস কত তোমার?' জানতে চাইলেন রাশেদ পাশা।

'সতেরো।'

'যে দুটো কাজ করেছ, সেগুলোর রেফারেন্স আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

ট্রিশের হাতে ফুল আঁকা কভারওয়ালা বড় একটা নোটবুক। সেটা থেকে প্লাস্টিকের কভারে মোড়া একটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে। 'এই যে, নিন। ফোন নম্বরগুলো নিচে।'

'দেখি, একজনকে অন্তত ফোন করে কথা বলে আসি,' কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। 'এখনই আসছি।' রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। লাগিয়ে দিলেন দরজাটা।

'ওকে রাখছ নাকি?' জিজ্ঞেস করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না কিশোর।

'তুই কি বলিস?' চাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার জন্যে কাউকে লাগবে না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল এরিক। 'তবে বেকির জন্যে দরকার।'

'দরকার তো আসলে তোর জন্যে,' বেকি বলল। 'আমি কি করলাম?'

ওদের কথায় কান দিলেন না মেরিচাচী। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, বললি না? মেয়েটাকে কেমন লাগছে তোর?'

'জানি না, চাচী,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর। 'কিন্তু ওকে দেখে মিস্টার ডেভিল যে কি রকম করল, যদি দেখতে। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। চেহারাই বদলে গেল বিড়ালটার। দাঁতগুলো সব বের করে এমন কাণ্ড শুরু করল, চমকে গিয়েছিলাম আমি।'

'অ, তারমানে বিড়ালটারও রসবোধ আছে,' হাসতে হাসতে বললেন মেরিচাচী। 'তবে মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'বিড়ালের রসবোধ! কি বলছ, চাচী তুমি? আমার তো মনে হলো ট্রিশকে দেখে আঁতকে উঠেছে মিস্টার ডেভিল।'

'নিয়ে নাও ওকে, ফুফু,' এরিক বলল। 'মেয়েটা দারুণ!'

এরিকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন চাচী। প্রচণ্ড ধমক লাগালেন,

'এক চড় লাগিয়ে দেব! এই বেয়াদব, মেয়েটা কি রে? এ ভাবে কথা বলা কোথায় শিখেছিস?'

টেলিফোন যন্ত্রটার নিচে ট্রিশের দেয়া কাগজটা চাপা দিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন মেরিচাচী। নম্বর টিপে কানে ঠেকালেন।

চাচীর কাছে দাঁড়ানো কিশোরও শুনতে পেল রিসিভারের মধ্যে রিঙ হওয়ার আওয়াজ। বিজি সিগন্যাল।

'এটাতে তো কথা বলছে,' মেরিচাচী বললেন। 'দ্বিতীয়টাতে দেখি।'

দ্বিতীয়টা থেকে কোন সাড়াই এল না। রিঙই হচ্ছে না।

'ট্রিশ আপাকে রেখেই দাও, ফুফু,' ধমক খেয়ে সাবধান হয়ে গেছে এরিক। 'তুমি নাকি মানুষ চেনো! সব সময়ই তো বলো।'

'হ্যাঁ, চিনি,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'মেয়েটাকে আমার ভালই মনে হচ্ছে। ওকে যেতে দেয়া উচিত হবে না।'

'খোঁজ-খবর কিছু না নিয়েই রেখে দেবে?' মেনে নিতে পারছে না কিশোর।

'ওসব পরেও নেয়া যাবে,' চাচী বললেন। 'এখন ওকে ছাড়া উচিত হবে না।'

'চাচী, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না!'

লিভিং রুম থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। ফিরে তাকাল কিশোর। তার চাচার সঙ্গে জমিয়ে ফেলেছে ট্রিশ। রাশেদ পাশাকে বলছে, 'আপনাদের বিড়ালটা আমাকে দেখে যে রকম শুরু করল, যদি দেখতেন।' এমন ভঙ্গি দেখাচ্ছে ট্রিশ, যেন কি মস্ত এক রসিকতা। 'সকাল বেলা খালার বাড়িতে একটা ইঁদুর ধরার কল পরিষ্কার করেছিলাম। আমার গায়ে ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে বিড়ালটা। জন্তু-জানোয়ারের ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।'

'তা ঠিক,' একমত হলেন রাশেদ পাশা। 'বদ্ধ টিনে কোন কিছু রাখলেও সেটার গন্ধ পেয়ে যায় মিস্টার ডেভিল।'

তিনি হাসলেন। হাসিতে যোগ দিল ট্রিশ।

নিজেকে রীতিমত বোকা মনে হতে লাগল কিশোরের। মনে হলো, মিস্টার ডেভিলের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটু বেশিই বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

চাচীর সঙ্গে লিভিং রুমে ঢুকল কিশোর। একটা কাউচে বসে পড়ল। দুই হাত কোলের ওপর।

মেরিচাচী বললেন, 'তোমার দুটো নম্বরের একটাতেও কথা বলতে পারলাম না।'

'তাই নাকি?' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ট্রিশ। 'অসুবিধে নেই। আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবে না ওরা, আমি শিওর।'

'আমিও শিওর,' উষ্ণ হাসি হাসলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'কাজটা তোমাকে দেয়া যেতে পারে, ট্রিশ,' মেরিচাচী বললেন। 'এখন ভেবে দেখো আমাদের এখানে কাজটা তুমি নেবে কিনা।'

'নেব না মানে!' হাসি ছড়িয়ে গেল ট্রিশের মুখে। 'আমি এ মুহূর্ত থেকে কাজে যোগ দিলাম!'

'এরিক! বেকি! এদিকে এসো,' মেরিচাচী ডাকলেন। 'তোমাদের ম্যাডামের সঙ্গে পরিচয় করে যাও।'

লজ্জিত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পায়ে পায়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'ভাই-বোন।

'ম্যাডাম বলার দরকার নেই,' কাউচ থেকে উঠে এগিয়ে গেল ট্রিশ। 'আমাকে আপা বলবে। ট্রিশ আপা। তারপর? কেমন আছ তোমরা? তোমাদেরকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

ভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরে রইল বেকি। তবে হাসি ফুটেছে মুখে।

'আমাদেরকে সব সময় ঘরের মধ্যে আটকে রাখবেন না তো?' সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন করল এরিক। 'সারাক্ষণ খালি "পড়ো, পড়ো" করবেন?'

'আরে না না, তা করব কেন?' হাসিমুখে বলল ট্রিশ। 'আমাকেই বরং তোমরা বলে দেবে কোন্‌টা আমার করা উচিত, কোন্‌টা উচিত না।'

'তা পারব,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল এরিক। 'কোন সমস্যা হবে না আপনার। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে শুধু হুকুম করবেন আমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' কিশোরের দিকে ফিরল ট্রিশ। 'কিশোর, তোমার বন্ধু হতে আমার আপত্তি নেই। আশা করি চমৎকার একটা সামার কাটাব আমরা এখানে।'

'দেখা যাক,' নিশ্চিত হতে পারল না কিশোর। সন্দেহটা থেকেই গেল তার।

'সুটকেসে করে আমার জিনিসপত্র নিয়েই এসেছি আমি। ভাবলাম, যদি চাকরিটা হয়েই যায়,' মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে বলল ট্রিশ। 'বাইরে রেখে এসেছি। নিয়ে আসিগে।'

ট্রিশকে ঘর থেকে বেরোতে দেখল না কিশোর। কারণ তার চোখ পাখির খাঁচাটার ওপর। চুপ করে আছে ও দুটো। সাধারণত যা থাকে না। সারাক্ষণই হয় কিচির-মিচির করে ওরা, নয়তো নরম সুরে শিস দেয়। বিশেষ করে থান্ডার। সে তো সারাক্ষণই ডাকাডাকি করতে থাকে।

কিন্তু এখন একেবারে চুপ করে আছে পাখি দুটো।

খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ওরা ঘুমিয়ে আছে কিনা দেখার জন্যে। না, জেগেই আছে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে খাঁচার ভেতরে ওদের বসার দণ্ডটার ওপর।

'অ্যাই, তোরা চুপ করে আছিস কেন?' খাঁচায় নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তারপরেও যখন শব্দ করল না পাখি দুটো, বলল সে, 'দেখো, চাচী, পাখি দুটোও অদ্ভুত আচরণ করছে...'

কারও সাড়া না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরে কেউ নেই। ট্রিশের পর পরই সবাই বেরিয়ে চলে গেছে।

আবার খাঁচার দিকে ফিরল কিশোর। 'অ্যাই, কথা বল্!' টোকা দিতে লাগল খাঁচার শিকে।

যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠল থান্ডার। হঠাৎ করে ডাকতে শুরু করল। তার সঙ্গে যোগ দিল ক্লাউড।

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। বাইরে কি করছে সবাই দেখার জন্যে।

*

কয়েক মিনিট পর দল বেঁধে ট্রিশের সঙ্গে দোতলায় উঠতে লাগল সবাই। তার ঘর দেখিয়ে দিতে।

ট্রিশের সুটকেসটা ভারী বলে রাশেদ পাশাই বয়ে নিয়ে এসেছেন। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন।

'এরিক আর বেকির পাশের ঘরটাতেই থাকো তুমি,' একটা ঘর দেখিয়ে বললেন মেরিচাচী। 'জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে সুইমিং পুলের কাছে চলে এসো। আমরা ওখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে,' হাসিমুখে জবাব দিল ট্রিশ। 'এমন একটা বাড়িতে থাকার জায়গা পেলাম, যেখানে সুইমিং পুলও আছে। সাঁতার কাটতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

বেকি আর এরিককে ট্রিশের সঙ্গে ঘরে রেখে মেরিচাচীও নিচে নেমে গেলেন। কিশোর গেল না। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখছে ট্রিশ কি করে।

পুরানো সুটকেসটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল ট্রিশ। ঝাঁকি লেগে লাফ দিয়ে খুলে গেল ধাতব খিল। ভেতরের কিছু কাপড়-চোপড় ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। কাপড়গুলো তুলে দেয়ার জন্যে। নীল একটা জামা তুলতেই ভাঁজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল একটা খবরের কাগজের কাটিং।

'কি লেখা ওটাতে?' ট্রিশকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মিষ্টি হাসিটা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল ট্রিশের মুখ থেকে। 'কিছু না,' বলে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রায় ছোঁ দিয়ে তুলে নিল কাগজের টুকরোটা।

পরক্ষণে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে, সরে গেল কিশোরের কাছ থেকে। কাগজের টুকরোটায় চোখ বোলাল।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। কাগজটাতে কি লেখা আছে? কি লুকাল ট্রিশ?

ঝটকা দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল ট্রিশ। 'দেখতে চাও কি আছে? এই যে। নাও।'

পুরানো কাটিং। হলদে হয়ে এসেছে কাগজটা।

হাতে নিল কিশোর। তারিখটা দেখল। দু'বছর আগের। হেডলাইনটা পড়ল: লীলা অ্যান্ডারসন এখনও অজ্ঞান।

নীরবে খবরটা পড়তে শুরু করল কিশোর।

১৫ বছর বয়েসী কিশোরী লীলা অ্যান্ডারসনের জ্ঞান এখনও ফেরেনি। প্যাসিফিক হাসপাতালেই রয়েছে সে। ডাক্তাররা বলছেন, এখনও বিপদমুক্ত হতে পারেনি। বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।

ডাক্তারদের ধারণা, প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস টেনে নেয়ার ফলে তার মগজের ক্ষতি হয়েছে। জ্ঞান যদি ফেরেও, বেঁচে যায় এ যাত্রা, মগজের যে ক্ষতিটা হয়েছে তাতে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হবে। মগজের গোলমাল কিংবা চিরস্থায়ী ভাবে মানসিক রোগী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

খবরটা পড়া শেষ করে মুখ তুলল কিশোর। 'বেচারি! তোমার কেউ হয় নাকি?'

'আমার বোন,' ট্রিশ জানাল। 'যমজ।'

'এখন কি অবস্থা?'

কাটিংটার দিকে চোখ নামাল ট্রিশ। 'এখনও বেঁচে আছে। সেই একই রকম অজ্ঞান।'

'আহারে! ইস্!' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর।

'না দেখে দুঃখ করছ,' রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে উঠল ট্রিশ। 'সামনাসামনি যদি দেখতে, দুঃখ করার বদলে ঘাবড়ে যেতে, লীলা এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।'

চার

পরদিন সকালে ডেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সকালের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগল। সূর্যের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে যেন পুরো প্রকৃতি।

ট্রিশকে দেখতে পেল। বনের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে নদীর দিকে। তার সঙ্গে খুশি মনে নাচতে নাচতে চলেছে এরিক আর বেকি।

একটা সাদা শার্ট গায়ে দিয়েছে ট্রিশ। নীল প্যান্ট। দারুণ সুন্দরী লাগছে ওকে।

ফিরে তাকাল ট্রিশ। কিশোরকে দেখে তার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

কিশোরও নাড়ল। ভদ্রতা করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পরিবারের সবাই ট্রিশকে অতিরিক্ত পছন্দ করে ফেলেছে। করাটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু তার নিজের মনের খুঁতখুঁতানিটা দূর করতে পারছে না কোন ভাবেই।

নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ছাউনিতে একটা সাইকেল পেল। সেটা নিয়ে রওনা হলো শহরে। ঘুরে দেখার জন্যে।

শহরে এসে প্রথমেই একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল সে। মুসা আর রবিনকে ফোন করার জন্যে। রবিনকে পাওয়া গেল না। বাড়ি নেই। কোথায়

বেরিয়েছে বলতে পারলেন না রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড।

মুসাকেও পাওয়া গেল না। তার আম্মা জানালেন ভোররাতের বাসেই ওশনসাইডে রওনা হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। মুসার আসার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাস স্টেশনে ছুটল সে।

রকি বীচ থেকে কিশোরের আসার সময় রবিন আর মুসা, দু'জনের কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। মেসেজ রেখে এসেছিল বোরিসের কাছে। বলে এসেছিল, ওরা দু'জন যদি আসতে আগ্রহী হয় আসতে পারে।

দূর থেকেই দেখতে পেল, বাস স্টেশনে ঢুকছে বাস। গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। কাছে যাওয়ার আগেই দেখল, দরজায় বেরিয়ে এসেছে মুসা।

'হাই', 'কেমন আছ', এ সব পর্ব শেষ হওয়ার পর রবিনের কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। সে আসেনি কেন, জানতে চাইল।

মুসা জানাল, লাইব্রেরিতে কাজ পড়ে গেছে রবিনের। আরও তিনদিন কাজ করতে হবে, তার আগে ছুটি পাবে না। ছুটি হলেই রওনা হয়ে যাবে।

'তারপর?' স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কেমন লাগছে ওশনসাইড?'

'এখনও দেখার সময়ই পাইনি,' কিশোর জানাল। 'তবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আসার খানিক পরেই।'

'কি ঘটনা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ট্রিশ নামে একটা মেয়েকে কাল বেবি-সিটারের চাকরি দিয়েছে চাচা-চাচী। এরিক আর বেকিকে দেখে রাখার জন্যে। বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকতে চায় না চাচা-চাচী। পোলাপান নিয়ে বেরোলে বেড়ানোর আনন্দ হবে মাটি। আমাকেও আটকাতে পারবে না, জানে। কে বসে বসে দুটো ছেলে-মেয়েকে পাহারা দেবে। তাই একজন লোকের দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'হুঁ। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনাটা কি? বেবি-সিটারের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে শেষে বলেই ফেলল কিশোর, 'মিস্টার ডেভিল ওকে পছন্দ করতে পারছে না। সে-জন্যেই আমার সন্দেহ। বোকামি মনে হচ্ছে নাকি তোমার?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'হচ্ছে না। জন্তু-জানোয়ারেরা অনেক সময় এমন সব ব্যাপার আঁচ করে ফেলে, যেটা মানুষ পারে না। ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মানুষের চেয়ে অনেক প্রখর।'

'সিরিয়াসলি বলছ?'

'তাই তো।'

সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে ঠেলতে ঠেলতে এগোল কিশোর। পাশে পাশে হেঁটে চলল মুসা।

'জন্তু-জানোয়ারেরা যে মানুষের চেয়ে সাবধানী, সেটা আমিও জানি,' কিশোর বলল। 'টিটু কি সব কাণ্ড করত, মনে নেই? রাফিয়ানও করে। মানুষ যেটা বুঝতে পারে না, অদ্ভুত ভাবে কি করে জানি সেটা আঁচ করে ফেলে

জন্তু-জানোয়ারেরা, বহুবার দেখেছি। সে-জন্যেই ট্রিশকে দেখে মিস্টার ডেভিল ওরকম খেপে যাওয়ায় সন্দেহটা হয়েছে আমার। এরিকদের পাখি দুটোও ট্রিশকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যায়। লক্ষ করেছি, বিড়ালটাও ভয় পায়, পাখি দুটোও। কিন্তু চাচা-চাচীকে বোঝাতে পারছি না কোনমতেই। ওদের ধারণা ট্রিশের মত মেয়েই হয় না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে রেখে আরেক হাতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। আচমকা মুসার দিকে ঘুরল। 'মুসা, আমার মনে হয় এখন আমাদের বাড়িতে না যাওয়াই উচিত তোমার। হোটেলে গিয়ে ওঠো।'

অবাক হলো মুসা। 'কেন?'

'কেন জানি না, ট্রিশকে আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মন বলছে, কোন একটা অঘটন ঘটানোর জন্যেই আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে ও।...তোমাকে ও দেখেনি যখন আপাতত দেখা দেয়ার দরকারও নেই। বলা যায় না, গোপনে তদন্তের দরকার পড়তে পারে। হোটেলে ওঠো। তারপর শহরে ঘোরাঘুরি করে খোঁজ-খবর নাও লোকের কাছে, ট্রিশ নামে কোন মেয়েকে কেউ চেনে কিনা। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল চাচী। এখানকারই ঠিকানা দিয়েছে ট্রিশ। ওর খালার বাড়ির ঠিকানা।'

মুসাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি রওনা হলো কিশোর।

কিছুদূর চালানোর পর সাইকেল থেকে নামল কিশোর। ঢাল বেয়ে ওঠা খুব কঠিন কাজ। চালিয়ে নেয়ার চেয়ে বরং ঠেলে নিয়ে ওঠা সহজ।

বাড়ির সামনে এনে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করাল সে। ঘরে ঢুকল। কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে চাচীকে ডাকল।

জবাব পেল না।

'বেকি? এরিক?' আবার ডাকল।

সাড়া নেই।

কাঁচের দরজাটা ঠেলে খুলে ডেকে বেরিয়ে এল সে।

সুইমিং পুলের দিকে চোখ পড়তেই ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ডটা।

বেকি!

পুলের ঠিক মাঝখানে ভাসছে সে।

চোখ বোজা। ভেজা চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মাথার চারপাশে।

বেকি! চিৎকার করতে চাইল কিশোর। কিন্তু শব্দ বের করতে পারছে না মুখ দিয়ে। আতঙ্কে জমে গেছে যেন।

সাঁতার জানে না বেকি। এ ভাবে ভেসে থাকার একটাই মানে। পানিতে ডুবে মারা গেছে লাশটা ভেসে উঠেছে পানির ওপর!

পাঁচ

'বেকি! বেকি!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

দুড়দাড় করে ডেকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পুলের দিকে দৌড় দিল।

পুলের কিনারে এসে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে পানির নিচ দিয়ে সাঁতরে চলল।

কাছে পৌঁছে পানির নিচে কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেল সে। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। কি আছে ওখানে?

সামনে গড়িয়ে এল ওটা। পথ রোধ করে দিল তার।

পানিতে রয়েছে ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। নাকে মুখে পানি ঢুকে গেল তার। দম আটকে যাচ্ছে। বুঝতে পারল তার সামনে রয়েছে ট্রিশ।

ট্রিশ!

ডুব দিয়ে ছিল পানির নিচে!

পানিতে ভেসে উঠে দম নেয়ার চেষ্টা করতে করতে রেগে উঠল কিশোর, 'কি ব্যাপার? কি হচ্ছে এখানে?'

'সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে,' ট্রিশও রেগে উঠল। 'কাপড়-চোপড় পরে এ ভাবে পানিতে লাফিয়ে পড়ার অর্থটা কি?'

হাত দিয়ে ডলে চোখের ওপর থেকে পানি সরাল কিশোর। মাথা তুলতে দেখল বেকিকে। ট্রিশের কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে জানাল, 'কিশোর ভাই, চিত হয়ে ভেসে থাকা শিখে ফেলেছি আমি।'

'তাই!' চমকের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি এখনও কিশোর। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ কমানোর চেষ্টা করল।

'বেকিকে সাঁতার শেখাচ্ছি,' ট্রিশ জানাল। 'পানির নিচ থেকে ওকে ঠেলে রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি এ ভাবে পাগলের মত ছুটে এলে কেন?'

দৌড়ে এলেন মেরিচাচী। তার পেছন পেছন এল এরিক।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এত চেঁচামেচি কিসের?'

প্রথমে কিশোরের দিকে তাকালেন, তারপর ট্রিশের দিকে।

'কিছু হয়নি, চাচী,' কিশোর বলল।

শার্ট-প্যান্ট-জুতো পরা কিশোরকে পানি থেকে উঠে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল মেরিচাচীর।

হা-হা করে হেসে উঠল এরিক। 'পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিলে,

তাই না, কিশোর ভাই?'

মাথা নিচু করে রইল কিশোর। চাচীর দিকে তাকাতে পারছে না।

'আস্ত একটা বেকুবের মত লাগছে তোমাকে, কিশোর ভাই!' হাসি আর থামতে চায় না এরিকের।

'এরিক, সর এখান থেকে!' ধমকের সুরে বললেন মেরিচাচী। 'ইচ্ছে হলে তুইও পানিতে নামগে, যা।' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'কিশোরের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

পানিতে নামার জন্যে কাপড় খুলতে শুরু করল এরিক।

'কিশোর, সমস্যাটা কি তোর?' পুলের কাছ থেকে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'আমি···আমি ভাবলাম রেকি ডুবে মারা গেছে,' চাচীর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না কিশোর। 'দূর থেকে দেখলাম পেট উঁচু করে ভেসে আছে। ওকে বাঁচানোর জন্যে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিলাম। বুঝতে পারিনি ট্রিশ ওকে সাঁতার শেখাচ্ছে।'

নরম হয়ে এল মেরিচাচীর মুখের ভঙ্গি। কিশোরের কপাল থেকে এক গুচ্ছ ভেজা চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি, না? পাওয়ারই কথা।'

'চাচী,' সাহস পেয়ে বলে ফেলল কিশোর, 'ট্রিশকে আমার ভাল লাগছে না। দেখলেই জানি কেমন লাগে। অশুভ কিছু একটা রয়েছে ওর মধ্যে।'

'বিড়ালটার কথা এখনও মাথা থেকে ঝাড়তে পারিসনি তুই।'

'শুধু বিড়ালটা না,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল কিশোর। 'পাখি দুটোও ওকে দেখলে চুপ করে যায়।'

'কিশোর,' সন্দেহের দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন মেরিচাচী, 'সত্যি করে বল তো দেখি, কি হয়েছে তোর?'

'যে টেলিফোন নম্বরগুলো দিয়েছে, আমার মনে হয় আরেকবার চেক করা উচিত।'

'তারমানে গোপনে খোঁজ-খবর করতে বলছিস?'

'গোপনে মানে? খোঁজ-খবর নেয়ার মধ্যে গোপনীয়তা দেখলে কোথায়?'

'তুই মনে করেছিস চুপ করে আছি। তা না। আরও কয়েকবার ফোন করার চেষ্টা করেছি,' মেরিচাচী বললেন। 'সেই একই অবস্থা। একটা সারাক্ষণ বিজি থাকে, আরেকটাতে রিংই হয় না।'

'অবাক লাগেনি তোমার কাছে?'

'না।'

'কোন রকম খটকা লাগছে না?'

'না,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'যে লাইনটা সারাক্ষণ বিজি থাকে, সে-পরিবারটায় নিশ্চয় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আছে, যারা সারাক্ষণ ফোন করেই চলেছে। এক মুহূর্তের বিরাম নেই। অন্য পরিবারটা বাড়ি-ঘরে তালা দিয়ে বেড়াতে চলে গেছে। এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু দেখছি না। আমি শিওর,

ওদেরকে যখন পাওয়া যাবে, জিজ্ঞেস করব, ট্রিশের পক্ষেই বলবে ওরা ভাল ভাল কথা।'

'তার যে একটা বোন হাসপাতালে দু'বছর ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সে-কথা জানো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ট্রিশ আমাকে বলেছে মেয়েটা নাকি ভয়ানক খারাপ স্বভাবের। অশুভ।'

'উঁহু, বলেনি,' মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আহারে, নিশ্চয় বোনকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে ট্রিশ। ওর সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করা উচিত আমাদের। খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ওর। আমাকে বলেছে, ওর বাবা-মা নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তারমানে আপনজন বলতে আছে কেবল একটামাত্র বোন। তা-ও মরে কি বাঁচে!'

'তুমি দুঃখ করছ। কিন্তু ট্রিশের কোন কষ্ট আছে বলে তো মনে হয়নি আমার। বরং কথার ধরনটাই ভাল ছিল না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আমার মনে হয় কোন ভুল করছিস তুই।' কিশোরের ভেজা চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন

পুলের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। বেকি আর এরিকের সঙ্গে বড় একটা রঙিন বল নিয়ে লোফালুফি খেলছে ট্রিশ। অন্তরঙ্গ সম্পর্কের নমুনা।

নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর। ভেজা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল। বিছানার নিচে বসে থাকতে দেখল মিস্টার ডেভিলকে। আদর করে ওর কানের পেছনটা চুলকে দিল সে।

'মিস্টার ডেভিল, তুই যদি কথা বলতে পারতি ভাল হত,' মৃদু স্বরে বলল কিশোর। 'আমাকে জানাতে পারতি, ট্রিশকে দেখলেই অমন খেপে উঠিস কেন। জানাটা আমার ভীষণ জরুরী।'

কথা বুঝতে পেরে যেন মাথাটা কিশোরের হাতের তালুতে ঘষতে আরম্ভ করল মিস্টার ডেভিল।

হাসল কিশোর। 'তোকেও আমার খুব পছন্দ, মিস্টার ডেভিল।'

কাপড় বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মিস্টার ডেভিলও বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে সঙ্গে নিচে চলল।

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে চাচা-চাচীর বেডরুমটার পাশ কাটাল কিশোর। শোবার ঘরটাকেই অফিস হিসেবেও ব্যবহার করছেন দু'জনে। চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছেন রাশেদ পাশা। কাজে এতই মগ্ন, মুখ তুলেও তাকালেন না।

ঘরের এক কোণে বসে কোলের ওপর ল্যাপটপ কম্পিউটারটা রেখে টাইপ করছেন মেরিচাচী। কিশোরের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। একবার হেসেই চোখ নামালেন আবার কম্পিউটারের দিকে।

কিশোরের সঙ্গে রান্নাঘরে না গিয়ে ঘুরে সদর দরজার দিকে হাঁটা দিল মিস্টার ডেভিল। বন্ধ দরজার পাল্লায় মাথা ঘষতে ঘষতে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। তার চোখে অনুনয় দেখে বুঝতে পারল কিশোর, বেরোতে

চায় বিড়ালটা। 'বেরোতে চাচ্ছিস? দাঁড়া, খুলছি।'

দরজাটা খুলে দিল কিশোর। বেরিয়ে গেল মিস্টার ডেভিল।

রান্নাঘরে ফিরে চলল কিশোর। একটা চিপসের প্যাকেট হাতে নিয়ে চলে এল জানালার ধারে। প্যাকেট ছিঁড়ে এক মুঠো চিপস মুখে ফেলে বাইরে তাকাল। বাড়ির সামনের দিকটা নজরে আসে এখান থেকে।

গেট দিয়ে ঢোকার রাস্তাটার ধারে, বাঁয়ের লনটায় এখন এরিক আর বেকির সঙ্গে খেলছে ট্রিশ।

আনমনে আরও কয়েকটা চিপস মুখে ফেলল কিশোর। রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেদিকে তাকাল সে। লাল গাড়িটা চোখে পড়ল।

চোখের কোণ দিয়ে এ সময় মিস্টার ডেভিলকে দেখতে পেল সে। বাড়িতে ঢোকার রাস্তায় উঠছে।

আচমকা বাধা পেয়ে গোঁ-গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন।

রাস্তায় চাকা ঘষার শব্দ।

'ঘটনাটা কি?' অবাক হলো কিশোর।

লাফ দিয়ে লনে নেমে তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল মিস্টার ডেভিল।

গাড়িটাকে আচমকা ঘুরে যেতে দেখে চমকে গেল কিশোর।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ড্রাইভার!

বশে রাখতে পারছে না গাড়িটাকে!

বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল গাড়ি। ছুটে আসতে শুরু করল এরিক আর বেকির দিকে। থামাতে না পারলে চাপা দেবে নিশ্চিত।

ছয়

চিৎকার করে উঠল কিশোর। দিশেহারা হয়ে গেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

লনে নেমে পড়েছে লাল গাড়িটা। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে।

চিৎকার করে উঠল বেকি।

দু'হাত মুখের ওপর তুলে নিয়ে এল এরিক।

অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে, সে গিয়ে এখন আর কিছু করতে পারবে না। সে ঘর থেকে বেরোনোর আগেই গাড়িটা এসে চাপা দেবে ওদের।

বেকি আর এরিকের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখা গেল ট্রিশকে। গর্জন তুলে ছুটতে থাকা গাড়িটার আড়ালে হারিয়ে গেল তিনজনে।

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরোল কিশোর। চাচা-চাচীর চিৎকার কানে এল।

বিকট একটা শব্দ হলো। কিশোরদের গাড়িটাতে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে রাস্তা থেকে আসা গাড়িটা।

বন্ধ হয়ে গেল ওটার ইঞ্জিন। দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা।

শুধুই নীরবতা এখন।

পলকের জন্যে। পরক্ষণে শোনা গেল মেরিচাচীর আতঙ্কিত চিৎকার। উন্মাদের মত চিৎকার শুরু করেছেন তিনি।

'ওরা ভালই আছে, আন্টি,' ট্রিশের কথা শোনা গেল। 'বেকি আর এরিক ভাল আছে।'

হাঁ করে দম নিচ্ছে কিশোর।

বেকি আর এরিককে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রিশ। বেকিকে টেনে তুলল সে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এরিক।

'খোদা!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'ট্রিশ, তুমি আজ বাঁচালে ওদের!'

ছুটে গিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে জড়িয়ে ধরলেন মেরিচাচী। বেকিকে কোলে তুলে নিলেন।

চমকের ধাক্কাটা কেটে যেতে কেঁদে উঠল বেকি। ফুফুর ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাতে লাগল।

লাল গাড়িটার দিকে ফিরল কিশোর। ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে আসছে একটা অল্পবয়েসী লোক। বিমূঢ়, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ঠিক আছে তো?'

'এ কাণ্ডটা কেন করলেন?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল ট্রিশ।

'আ-আমি···জা-জানি না!' তোতলাতে শুরু করল লোকটা। 'সত্যি বলছি! আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না!' নিজের গাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল সে। কিশোরদের গাড়ির একপাশে গুঁতো মেরেছে।

'আমি আস্তে আস্তেই চালাচ্ছিলাম,' লোকটা বলল। 'হঠাৎ করে গজরাতে শুরু করল ইঞ্জিন, গতি বেড়ে গেল। স্টীয়ারিং কাজ করল না। ব্রেক চাপলাম। ওটাও কাজ করল না।'

'মদ খেয়েছেন নাকি?' রেগে উঠলেন রাশেদ পাশা।

'না না, কসম খোদার! ও সব আমি খাই-টাই না! কি যে ঘটল, সত্যি বলতে পারব না। গতি বাড়াইনি! মদ খাইনি! আমার এত খারাপ লাগছে···' চোখ নামাল লোকটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের চাচা। বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না। তবে এ নিয়ে আর রাগারাগি করলেন না।

'ভাগ্যিস, কেউ চাপা পড়েনি।' বললেন তিনি। 'গ্যারেজে ফোন করা দরকার।'

ফোন করার জন্যে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

লাল গাড়িটার সামনের চাকার ফাঁকে একটা ডোরা কাটা লেজ চোখে পড়ল কিশোরের।

এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসে চাকার ফাঁকে আটকে থাকা বিড়ালটাকে বের

করে আনল সে। তার হাতে নিথর হয়ে ঝুলে রইল মিস্টার ডেভিলের রক্তাক্ত দেহ। নিজের অজান্তেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

'ওহ্, খোদা!' কপালে চাপড় মারল লোকটা। 'সত্যি বলছি, ইচ্ছে করে চাপা দিইনি বিড়ালটাকে! আমি ওকে দেখিইনি!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। তারপর ট্রিশের দিকে তাকাল

ট্রিশের ঠোঁটের কোণে আলতো একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

বিশ্বাস হতে চাইল না কিশোরের। সত্যি হাসছে ট্রিশ?

মিস্টার ডেভিলের লাশটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রিশের মুখোমুখি হলো। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'বিড়ালটা মারা যাওয়ায় খুশি হয়েছ তুমি!'

'কিশোর, দোহাই তোর, ওর সঙ্গে লাগতে যাসনে!' এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'বিড়ালটা মারা যাওয়ায় ও খুশি হবে কেন?'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল এরিক। মৃত বিড়ালটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর ভাই, সত্যি সত্যি মরে গেছে মিস্টার ডেভিল? মা খুব কষ্ট পাবে। বিড়ালটাকে কি যে ভালবাসত।'

জবাব দিল না কিশোর। বনের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল সেদিকে। কিছু দূর গিয়ে ফিরে তাকাল। 'এরিক, একটা শাবল নিয়ে আসবে? ছাউনিতে পাবে।'

'এখুনি আনছি,' ছাউনির দিকে দৌড় দিল এরিক।

আবার হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

দুই মিনিটের মধ্যেই একটা ছোট শাবল হাতে বেরিয়ে এল এরিক। দৌড়ে চলল কিশোরকে ধরার জন্যে।

বনে ঢুকল দু'জনে। ঢাল বেয়ে নেমে গেছে গাছপালা। বড় বড় দুটো পাথর পড়ে আছে এক জায়গায়। মাঝখানে সরু ফাঁক। একজন লোক কোনমতে ভেতর দিয়ে যেতে পারে।

জায়গাটা পছন্দ হলো কিশোরের। ফাঁকের কাছে এসে দাঁড়াল। বিড়ালটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

কোমরে দুই হাত রেখে চুপচাপ দেখছে এরিক। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় মারল। খানিক পরেই ফিরে এল বুনো ফুল-পাতা সহ কতগুলো ডাল নিয়ে। কিশোরের পাশে বসে ফুলগুলো ছিঁড়ে রাখল মাটিতে। মন ভীষণ খারাপ। বিড়ালটার জন্যে। তবে কাঁদল না।

একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল কিশোর। তাতে ডাল-পাতা বিছিয়ে দিল এরিক। 'এই বিছানায় আরামেই থাকবে মিস্টার ডেভিল, কি বলো, কিশোর ভাই?'

গর্তের মধ্যে পাতার বিছানায় বিড়ালটাকে শুইয়ে দিল ওরা। মাটি চাপা দিয়ে কবর দিল। কবরের ওপর বিছিয়ে দিল বুনো ফুল। কানে আসছে গাছের ফাঁকে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাসের একটানা শব্দ।

এরিকের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। নিজের ভাবনাটাকেই যেন শব্দ করে মেলে দিল এরিকের কাছে, 'গাড়িটা যে ভাবে ছুটে এল, অবাক লাগেনি তোমার?'

'ভয়ে এমনই কাবু হয়ে গিয়েছিলাম, কি যে দেখেছি কিছুই মনে নেই,' জবাব দিল এরিক। 'বলের দিকে ছিল মনোযোগ। গাড়িটাকে আসতেও দেখিনি। তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি। মনে হলো, হঠাৎ করে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল গাড়িটা। সব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিজেই নিজেকে চালানো শুরু করল।'

অবশ লাগছে কিশোরের। ভীষণ ক্লান্ত।

রাতে ভাল করে খেতে পারেনি। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না বিড়ালটার মৃত্যুর পেছনে ট্রিশের হাত আছে। মুসার সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে এসেছে। মুসা অবশ্য বিশ্বাস করেছে। অবাস্তব অস্বাভাবিক ঘটনায় তার অবিশ্বাস নেই।

মুসা জানিয়েছে, যতটা পেরেছে খোঁজ-খবর করেছে সে। ট্রিশ অ্যান্ডারসন বা শীলাকে চেনে এমন কাউকে খুঁজে পায়নি ওশনসাইডে। আরও ভালমত খোঁজ নেয়ার কথা তাকে বলে এসেছে কিশোর।

খাওয়ার পর সোজা নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে সে। শুয়ে শুয়ে ভাবছে। লিভিং রুম থেকে ভেসে আসছে হাসির শব্দ। টেলিভিশন দেখছে সবাই। বেকি আর এরিকের মন থেকে অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা মুছে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা।

বড় শহরের মত ইলেকট্রিসিটির অত্যাচার নেই এখানে। অত আলোও নেই। জানালা দিয়ে আসছে আকাশ থেকে ঝরা কালচে-ধূসর আলো। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর, বলতে পারবে না।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের।

উঠে বসল বিছানায়।

অন্ধকার ঘর। লাল আলোটা কিসের?

বুঝতে পারল, ওর ডিজিটাল ঘড়ির। কোথায় রয়েছে, তা-ও মনে পড়ল। নিজেদের রকি বীচের বাড়িতে নয়।

কানে আসছে ঝিঁঝির ডাক। নীরবতার মাঝে অনেক জোরাল শোনাচ্ছে দটা। ঘড়ির লাল নম্বরগুলো বলছে, রাত বারোটা বেজে একত্রিশ।

বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। এক ফালি ফ্যাকাসে চাঁদ আলো ছড়িয়ে দিতে লাগল তার ওপর।

গুড়গুড় করে উঠল তার খালি পেট। গলাও শুকনো। পিপাসা পেয়েছে পানি দরকার। দুই হাতে চোখ রগড়াল। বেরিয়ে এল অন্ধকার হলওয়েতে

পুরো বাড়িটা নীরব। সবাই শুয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে এগোল কিশোর।

চোখ পড়ল ট্রিশের ঘরের ওপর। দরজা খোলা।

কৌতূহল হলো কিশোরের। ট্রিশ কি বাইরে বেরিয়েছে?

সাবধানে গিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল কিশোর।

অন্ধকার ঘর। দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। তার গায়ে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো। পরনে সাদা, ঢোলা, হাতাকাটা গাউন।

এত লম্বা লাগছে কেন ওকে? অবাক হয়ে ভাবল কিশোর। অন্ধকার বেডরুমে চঞ্চল ঘুরতে থাকল তার দৃষ্টি।

আলোর কারসাজি? ভুল-ভাল দেখছে?

নাকি এখনও দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে?

হঠাৎ কিশোরের অস্তিত্ব টের পেয়ে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল ট্রিশ।

চিৎকারটা বেরিয়ে চলে এসেছিল। তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে ফেলল কিশোর।

ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় বিকৃত লাগছে ট্রিশের মুখ। ভয়ানক লাগছে চেহারা। অশুভ পিশাচ।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ট্রিশ। নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর হাসি।

ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে কিশোর। কিন্তু পারছে না।

ট্রিশের চোখের দৃষ্টি আটকে রেখেছে ওকে।

এমন কিছু রয়েছে সে-দৃষ্টিতে, নড়তে পারছে না সে।

কি আছে? কি আছে?

এত লম্বা লাগছে কেন ট্রিশকে?

চোখে পড়ল কিশোরের। কেন লম্বা লাগছে, বুঝতে পারল।

অবিশ্বাস্য!

কিন্তু বাস্তব!

মেঝের ফুটখানেক ওপরে খাড়া হয়ে ভেসে রয়েছে ট্রিশ।

হঠাৎ তীব্র এক ঝলক আলোর রশ্মি বিদ্যুৎ শিখার মত ছুটে এল কিশোরের দিকে।

সাত

ছোপ ছোপ গাঢ় বেগুনী রঙ ভাসছে কিশোরের চোখের সামনে। আবার গভীর অন্ধকারে ডুব দিতে চাইছে তার দেহের একটা অংশ। আরেকটা অংশ জেগে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

বেগুনী রঙটা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ধূসর হয়ে গেল।

চোখের সামনে থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশা। চাচার মুখটা দেখতে পেল। বহুদূরে। তারপর কাছে।

আরও কাছে।

'জ্ঞান ফিরছে,' তাঁকে বলতে শুনল কিশোর। কপালে ঠাণ্ডা স্পর্শ। ওর চাচীর উদ্বিগ্ন মুখটা দেখা দিল ধূসর ঝিলিমিলির মধ্যে।

'কি হয়েছিল?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমার মাথা ব্যথা করছে। তোমরা এখানে কেন?'

'বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলি তুই,' চাচা বললেন। 'ঘরে পানি শেষ। ফ্রিজ থেকে আনতে যাচ্ছিলাম। দেখি ট্রিশের ঘরের বাইরে পড়ে আছিস।'

ট্রিশ!

নামটা ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কিশোরকে। কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করল সে। 'ওকে বিদেয় করো জলদি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'এখনই বের করে দাও! প্লীজ!'

'শান্ত হ, বাবা!' কোমল কণ্ঠে বলে আস্তে করে কিশোরের একটা হাত তুলে নিলেন মেরিচাচী।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। 'শান্ত আমি হতে পারছি না! জলদি যদি ওকে বের না করো, সর্বনাশ করে দেবে আমাদের।' গলা কাঁপছে তার। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কিন্তু কিছু করার নেই। 'ট্রিশকে শূন্যে ভাসতে দেখেছি আমি! নিজের চোখে!'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন মেরিচাচী ও রাশেদ পাশা। উদ্বেগ ফুটল চোখে।

'আমি সত্যি বলছি!' কিশোর বলল। 'শূন্যে ভাসছিল ট্রিশ। মেঝে থেকে ফুটখানেক উঁচুতে শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে হেসে উঠল পাগলের মত। একটা বিদ্যুতের শিখার মত জিনিস ছুঁড়ে মারল।...নইলে আমি বেহুঁশ হলাম কেন, বুঝতে পারছ না?'

আস্তে আস্তে কিশোরের কাঁধ ডলে দিতে লাগলেন রাশেদ পাশা। 'তা পারছি না। কিন্তু কিছু একটা যে হয়েছে তোর মগজে...'

'আমি পাগল! পাগল ভাবছ আমাকে?' লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'এসো আমার সঙ্গে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'নিজের চোখে দেখবে।'

'কিশোর! থাম্! কিশোর!' অনুরোধ করলেন মেরিচাচী।

কিন্তু ট্রিশের ঘরের কাছে পৌঁছে গেছে কিশোর। এক ধাক্কায় খুলে ফেলল পাল্লা। ফিরে তাকিয়ে দেখল ঠিক তার পেছনেই রয়েছেন চাচা-চাচী।

ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখল ট্রিশকে।

ঘুমাচ্ছে?

'কি হয়েছে?' মাথা তুলল ট্রিশ। 'কোন সমস্যা?' ঘুম-জড়িত কণ্ঠ।

থরথর করে কাঁপছে কিশোর। 'তুমি শূন্যে ভেসেছিলে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'অস্বীকার করে লাভ নেই। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'শূন্যে ভাসছিলাম?' চোখ ডলতে ডলতে বলল ট্রিশ। 'কিশোর, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মানুষ আবার শূন্যে ভাসে কি করে?'

ওর এই নিরীহ ভঙ্গি আরও রাগিয়ে দিল কিশোরকে। চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'সে-জন্যেই তো আমার মনে হচ্ছে, তুমি মানুষ নও। ডাইনী গোছের কিছু, যদিও এ সব আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম—গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এসে বিড়ালটাকে খুন করালে, চাঁদের আলোয় ঘরের মধ্যে শূন্যে ভেসে থাকলে, তারপর স্টার ওঅরসের যোদ্ধাদের মত বিদ্যুৎ শিখা ছুঁড়ে মেরে বেহুঁশ করলে আমাকে—তাতে তোমাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

কিশোরের চাচা-চাচীর দিকে মুখ ফেরাল ট্রিশ। 'ও কি আমার সঙ্গে মজা করছে রাত দুপুরে?'

ওর এই অভিনয় আর সহ্য করতে পারল না কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যুক কোথাকার! খবরদার বলছি, আমাকে পাগল প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে না!'

ভীষণ চমকে যাওয়ার ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল ট্রিশের মুখ।

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরলেন রাশেদ পাশা।

তাতে রাগ আরও বেড়ে গেল কিশোরের। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না কোনমতে। হঠাৎ তার মনে হলো, এ রকম মাথা গরম তো সে নয়! এর পেছনেও কি ট্রিশের কারসাজি রয়েছে? অসম্ভব না।

নিজেকে শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কিশোর।

শক্ত করে ধরে রাখলেন রাশেদ পাশা, যাতে ছুটতে না পারে কিশোর। তিনি নিশ্চয় ভাবছেন, ছেড়ে দিলেই গিয়ে ট্রিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিশোর।

'কিছু মনে কোরো না, ট্রিশ,' বললেন তিনি। 'যাও, শুয়ে পড়ো। আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ট্রিশের। বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে নাকি ওর? এ রকম পাগলের মত করছে কেন? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না না, লাগবে না,' রাশেদ পাশা বললেন। 'আমরাই সামলাতে পারব। তুমি বরং ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

বাধা দিল না আর কিশোর। ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে। লিভিং রুমে।

কিশোরকে সোফায় বসিয়ে দিলেন। হাত ছাড়লেন না। শক্ত করে ধরে রাখলেন।

রাগ লাগছে কিশোরের। হতাশা, ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। মরিয়া হয়ে উঠতে চাইছে। মনে হলো প্রাণভরে চিৎকার করতে পারলে এই চাপ অনেকটা কমত।

পায়ের শব্দ কানে এল তার। ঘরে ঢুকেছে কেউ। মুখ তুলে দেখে এরিক। ঘুমে ভরা চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে কিশোর ভাইয়ের?'

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে দরজার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'কিছু না। মিস্টার ডেভিলের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে তোমার কিশোর ভাই। যাও, ঘুমাতে যাও।'

'তার আর কি দোষ,' বিড়বিড় করে বলল এরিক। 'আমারই কান্না পাচ্ছে।' টলতে টলতে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে আবার কি করে বসে সে-জন্যে তার সঙ্গে গেলেন মেরিচাচী।

'আসলে তোর কি হয়েছে, বল্ তো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা। 'মাথার মধ্যে কি কোন রকম খারাপ অনুভূতি হচ্ছে? কারও ওপর আক্রোশ, কাউকে খুন করতে ইচ্ছে করছে?—আগের বার যেমন হয়েছিল?'

'না, ওরকম কিছুই হচ্ছে না,' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'চাচা, বিশ্বাস করো, ট্রিশের ব্যাপারে একটা বর্ণ বাড়িয়ে বলছি না আমি। আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে শূন্যে ভেসে থাকতে। ও তোমাদের ভুল বোঝাচ্ছে, চাচা···'

ফিরে এলেন মেরিচাচী। কিশোরের পাশে বসলেন। 'কিশোর, তোর কি মনে হচ্ছে, আমাদের মনে তোর জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছে ট্রিশ? ওকে তোর চেয়ে বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছি আমরা?'

'চাচী, দোহাই তোমার!' ককিয়ে উঠল কিশোর। 'মেজাজটা আরও খারাপ কোরো না! কেন আমার কথা বিশ্বাস করছ না? তোমরা কি ভাবছ আমি আবার পাগল হয়ে গেছি, আগের মত?'

চাচা-চাচীকে চুপ করে থাকতে দেখে অন্য ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো—আগে কখনও এ রকম করতে দেখেছ আমাকে? ভূত-প্রেত-ডাইনী কিংবা এ ধরনের জিনিসগুলোকেই আমি অবাস্তব মনে করি। তাহলে শুধু শুধু ট্রিশের ব্যাপারে মিথ্যে বলতে যাব কেন? ওর সঙ্গে কি আমার কোন শত্রুতা আছে?'

'না,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'তবে চোখের ভুল হতেই পারে···'

'তাহলে বেহুঁশ হলাম কেন?'

'কিশোর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চাচী বললেন, 'রাতে তুই প্রায় কিছুই খাসনি। ক্লান্তি আর পেটে অতিরিক্ত খিদে থাকলেও মানুষ অনেক সময় নানা রকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ পেটে খিদে থাকাতে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম ট্রিশের দরজার সামনে?'

'তা বলছি না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি ওখানে। ঘুমের ঘোরেই কোন কারণে বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছিলি। হতে পারে খাওয়ার জন্যে নিচে যাচ্ছিলি। কিন্তু পরে নিচে না গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলি, বারান্দায়, বিছানা ভেবে। ঘুমের ঘোরে কত কাণ্ডই তো করে মানুষ।'

'তারমানে বলতে চাইছ নিশিতে পেয়েছিল আমাকে?'

'অবাস্তব কিছু না এটা। অনেক মানুষকেই পায়।'

'হ্যাঁ, এইটা সম্ভব,' স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা।

বার বার ছাগলকে কুকুর বলে যেমন ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল তিন ঠগ যে আসলে ওটা ছাগল না, কুকুরই; কিশোরেরও সেই অবস্থা হয়ে গেল এখন। ভাবতে আরম্ভ করল সে, ট্রিশকে শূন্যে খাড়া হয়ে থাকতে দেখাটা বোধহয় কল্পনাই ছিল তার। দুঃস্বপ্ন দেখার কুফল। হয়তো সত্যিই ঘুমের মধ্যে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত বিছানা থেকে নেমে গিয়েছিল সে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রিশের ঘরের সামনে।

রাত দুপুরে অন্যের ঘরের দরজার সামনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াটা অনেক বেশি বাস্তব, কাউকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখার চেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল সে। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব কোনমতেই খুঁজে পেল না—তার দিকে বিদ্যুৎ শিখা ছুটে আসার ব্যাপারটা। ওটাকে কি বলবে? দুঃস্বপ্ন?

অকারণ আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে বিড়বিড় করে বলল সে, 'কি জানি, হয়তো তোমাদের কথাই ঠিক।'

ওষুধ ধরছে বুঝতে পেরে সোফায় নড়েচড়ে বসলেন মেরিচাচী। 'স্নায়ুর ওপর অতিরিক্ত চাপ মানুষের সর্বনাশ করে দেয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব সময়ই একটা চাপের মধ্যে থাকে। আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো উচিত তোর। মানসিক রোগের ডাক্তাররা ভাল পরামর্শ দিতে পারবে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'উহ্, চাচী! তোমার ওসব ম্যাগাজিন-পড়া আর্টিক্যালের গবেষণাটা আমার ওপর চালিও না তো আর দয়া করে। আমার কোন ডাক্তারের দরকার নেই।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন চাচী। 'অনেক সময় মনের কথা অন্যকে বললে ভারটা অনেক হালকা হয়ে যায়। একটু আগেই নিশিতে পাওয়া মানুষের ওপর লেখা একটা বই শেষ করলাম। স্বপ্নচর বা ঘুমের মধ্যে যারা হাঁটে তাদেরকে এই দলে ফেলা হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই দেখা গেছে, স্নায়ুর অতিরিক্ত উত্তেজনা কিংবা চাপের ফলেই এ সব কাণ্ড করে মানুষ।'

চাচীর লেকচার অসহ্য লেগে উঠল কিশোরের। সাহায্যের আশায় চাচার দিকে তাকাল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন চাচা। তারপর বললেন, 'এখন ওসব আলোচনা বাদ দিয়ে চলো সবাই ঘুমোতে যাই। সকালবেলা ফ্রেশ মাইন্ডে কথা বলা যাবে।'

*

বিছানায় শুয়েও আর ঘুম এল না কিশোরের। পুরো সজাগ।

চিন্তার গতি রুদ্ধ করতে পারছে না। ট্রিশ আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব খেলে যেতে থাকল মনের পর্দায়। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল, মাটির এক ফুট ওপরে খাড়া হয়ে আছে ট্রিশ।

শূন্যে ভাসমান।

সত্যি কি?

এ রকম একটা অবাস্তব পাগলামির কথা বিশ্বাস না করার জন্যে চাচা-চাচীকে দোষ দেয়া যায় না।

আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে পড়ে পড়ে ভাবছে আর ঝিঁঝির ডাক শুনছে কিশোর। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে সরু একফালি চাঁদের আলো। বিচিত্র আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে মেঝেতে।

হঠাৎ একরাশ ক্লান্তি এসে চেপে ধরল কিশোরকে। মনে হতে লাগল সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার।

কিন্তু ঘুমাতে পারছে না। ঘুমাতে ভয় লাগছে। আবার যদি দুঃস্বপ্ন দেখে? ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন!

তবে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। অস্থির ঘুম। ভেঙে গেল একটু পরেই। ঘড়িতে দেখল দুটো বিশ বাজে।

বালিশে মাথা রাখতে ভাল লাগছে না। উঠে বসল বিছানায়। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। অন্য একটা শব্দ কানে এল তার।

জেগে আছে কেউ। ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িতে।

শরীরের সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে গেল। বিছানায় থাকতে পারল না আর। কৌতূহল দমাতে না পেরে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল আবার ঘরের বাইরে।

কে হাঁটে?

জানা দরকার।

দেয়াল ঘেঁষে এগোনো শুরু করল সে। ট্রিশের ঘরের দিকে। দরজাটা খোলা দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল তার।

দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে আসার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। ট্রিশের ঘরে উঁকি দিয়ে আবার কোন্ ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পাবে, জানে না।

সাহস করে উঁকি দিয়ে ফেলল ঘরের ভেতর। বিছানা শূন্য। চাঁদের আলো এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে এলোমেলো চাদর।

গভীর দম নিল কিশোর। ট্রিশ গেল কোথায়?

রান্নাঘরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পা টিপে টিপে নেমে এল সে। আলো জ্বলছে রান্নাঘরে।

ট্রিশকে দেখতে পেল। পরনে নাইট-গাউন। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে খাচ্ছে। রাত দুপুরে খিদে পাওয়ার স্বভাব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

চিন্তামুক্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে এল দোতলায়। ট্রিশের দরজার সামনে দিয়ে এগোতে গিয়ে থেমে গেল।

খবরের কাগজের কাটিংগুলো!

ট্রিশের বিছানার মাঝখানে পড়ে আছে।

আগে দেখলাম না কেন? অবাক হলো কিশোর। বুঝতে পারল, কেন

দেখেনি। অন্ধকারে ছিল তখন ওগুলো। চাঁদের আলো সরে গিয়ে এখন কাগজগুলোর ওপর পড়েছে।

কি লেখা আছে দেখতেই হবে। ওর কাছ থেকে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে ট্রিশ, না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। ট্রিশ নেই। এখনও রান্নাঘরেই আছে।

এটাই সুযোগ। ঢুকে পড়ল ট্রিশের ঘরে। বিছানার দিকে এগোল।

ঝুঁকে একখানে জড় করল কাগজগুলো। চোদ্দ-পনেরোটা টুকরো হবে।

কাঁপা হাতে একটা টুকরো তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় হেডলাইনটা পড়লঃ হাসপাতালেই রয়েছে এখনও বেচারি লীলা।

সেটা ফেলে দিয়ে আরেকটা টুকরো তুলে নিল।

কিন্তু চোখের সামনে আনার আগেই ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল ঘাড়ে। ঘাড় চেপে ধরেছে বরফের মত শীতল কতগুলো আঙুল।

আট

সরে গেল কিশোর। হাত থেকে খসে পড়ল খবরের কাগজের কাটিং। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'ট্রিশ!'

একটা কথাও বলল না ট্রিশ। রাগে জ্বলছে চোখ।

ঘাড় ডলতে লাগল কিশোর। না দেখেও বুঝতে পারল লাল দাগ পড়ে গেছে। ভয়ানক শক্তি ট্রিশের গায়ে। আঙুল তো নয়, যেন সাঁড়াশির চাপ। একজন মেয়েমানুষের গায়ে এত শক্তি! অবিশ্বাস্যই লাগল তার কাছে।

খোলা জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল দমকা বাতাস। কাগজের টুকরোগুলোকে এলোমেলো করে দিল। উড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলল কয়েকটা।

এক পা পিছিয়ে গেল ট্রিশ। মেঝেতে পড়া টুকরোগুলোকে পাহারা দিতে লাগল। যাতে তুলতে না পারে কিশোর।

'বেরোও, আমার ঘর থেকে!' প্রচণ্ড রাগে হিসিয়ে উঠল ট্রিশ। 'আরেকবার ধরতে পারলে ভাল হবে না বলে দিলাম!'

'না না, আর হবে না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর। ভয় পাচ্ছে ট্রিশকে। তাকাতে পারছে না ভয়ঙ্কর চোখ দুটোর দিকে। একটা সেকেন্ড আর দেরি না করে বেরিয়ে চলে এল ঘর থেকে।

দড়াম করে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিল ট্রিশ।

দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। ট্রিশকে ভয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা জিনিস চোখে

পড়ায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

পাশের আরেকটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা খবরের কাগজের কাটিং। বাতাসে ট্রিশের ঘর থেকে উড়িয়ে এনে ফেলেছে।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়েই দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল কিশোর। এক হাতে দরজা লাগিয়ে অন্য হাতে আলোর সুইচ টিপে দিল।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে। কাগজটার দিকে তাকাল। নাম দেখা যাচ্ছেঃ হেরিং বীচ টাইমস।

রকি বীচ থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা। বিশ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু ওশনসাইড থেকে যথেষ্ট দূরে। হেরিং বীচের খবরে আগ্রহী কেন ট্রিশ?

এই কাটিংটাও দুই বছরের পুরানো।

বুকের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। পড়তে শুরু করল।

মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনার কথা লেখা রয়েছে কাগজে। হেরিং বীচের একটা বাড়িতে এক সকালে মৃত পাওয়া যায় মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ডারসন নামে এক দম্পতিকে। বেঁচে যায় কেবল তাদের মেয়ে, লীলা অ্যান্ডারসন। তারমানে ট্রিশের বোন–ভাবল কিশোর। যে এখনও হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে।

কাগজের কথামত, মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা ভাবছে পুলিশ। বাড়ির গ্যারেজে ভুল করে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে রেখে দেয়া হয়েছিল। প্রথমে বিষাক্ত কার্বন মনক্সাইড গ্যাসে ভরে যায় গ্যারেজ। সেখান থেকে হীটিং আর কুলিং সিসটেমের পাইপের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। ঘুমের মধ্যে সেই গ্যাস ফুসফুসে ঢুকে মৃত্যু ঘটায় অ্যান্ডারসন দম্পতির। বাবা-মা'র মত মারা যায়নি লীলা, তবে গভীর ঘুমও ভাঙছে না আর।

হাঁ করে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ট্রিশের নাম লেখা নেই কোথাও।

কেন নেই? ও তখন কোথায় ছিল? খালার বাড়িতে? বেঁচে আছে, এটা তো রিপোর্টারদের জেনে যাওয়ার কথা। উল্লেখ করেনি কেন?

এর একটা জবাব হতে পারে, প্রচুর নতুন নতুন পত্রিকার জন্ম হচ্ছে। তাতে কাজ করছে নতুন রিপোর্টার, যারা এখনও দক্ষ হয়ে ওঠেনি। খবরটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে সে-কারণেই। ভাবল বটে কিশোর, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না।

ভাবতে ভাবতে আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। ট্রিশ বলেছিল, তার বাবা-মা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

মিথ্যে কথা বলল কেন?

সবগুলো কাটিং পড়তে পারলে হয়তো এ সব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে

হাই উঠতে লাগল কিশোরের। কিন্তু শুতে ইচ্ছে করছে না

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। পর্দা সরিয়ে দিল চাঁদের আলোয়

নেয়ে যাচ্ছে বনভূমি। খুবই সুন্দর। লুটিয়ে উপভোগ করতে পারত, যদি কেবল ট্রিশ এসে না ঢুকত বাড়িতে।

অশুভ মনে হচ্ছে ওকে। ভাগানো দরকার। কাটিংগুলো জোগাড় করা গেলে সেগুলো দেখিয়ে চাচা-চাচীকে বিশ্বাস করানো যাবে–এরিক আর বেকির জন্যে ট্রিশ বিপজ্জনক। আপাতত যে কাটিংটা পেয়েছে, সকালবেলা উঠে সেটাই দেখাবে। ট্রিশ যে অন্তত একটা মিথ্যে কথা বলেছে, প্রমাণ করা যাবে এ কাটিংটা দিয়েই।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। টান দিয়ে কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল। রাখতে গেল ভেতরে।

গরম লাগছে আঙুলে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে যেমন আঁচ লাগে। আঙুলের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল। আগুন ধরে গেছে কাটিংটায়। আঙুলে লাগতে সামান্যই বাকি আছে।

অস্ফুট চিৎকার দিয়ে কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিল সে। পড়ল ওটা কার্পেটের ওপর। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কার্পেটে।

চিৎকার করে পা দিয়ে মাড়ানো শুরু করল সে। কিন্তু নিভতে চাইল না আগুনটা। বেড়ে গিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে একটানে চাদরটা তুলে এনে সেটা দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল আগুনে।

অদ্ভুত আরেকটা কাণ্ড ঘটল এ সময়।

হাসি!

কানে বাজছে অট্টহাসির শব্দ। কে হাসে?

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। কাউকে দেখা গেল না। আতঙ্কিত হয়ে বুঝতে পারল, হাসিটা বাজছে তার নিজের মগজের মধ্যে।

দুই হাতে মাথা টিপে ধরল।

হাসি থামছে না।

ভয়ঙ্কর, শয়তানি হাসি।

চোখ বুজে, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিটা দূর করার চেষ্টা করল।

লাভ হলো না। থামল না হাসিটা।

চিনতে পারছে। এ হাসি আগেও শুনেছে সে। ট্রিশের কণ্ঠ! নিজের ঘরে চাঁদের আলোয় শূন্যে ভেসে থেকে কিশোরকে দেখে এ রকম হাসিই হেসেছিল সে।

'থামো!' সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'দোহাই তোমার! হাসি থামাও!'

নয়

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে সাবধানে আগে ট্রিশের ঘরে উঁকি দিল কিশোর। দরজা বন্ধ।

যা করার এখনই করতে হবে। সবাই উঠে পড়ার আগেই।

ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ঘুমায়নি সে। কিন্তু পুরোপুরি সজাগ হয়ে আছে। দেহের প্রতিটি স্নায়ু সতর্ক। যেন নতুন কোন শক্তি এসে ভর করেছে শরীরে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকল সে। আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রিসিভারটা তুলে নিয়ে নম্বর টিপল। রবিনদের বাড়ির নম্বর।

ওপাশে রিঙ হতে থাকল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

চার বার রিঙ হলো। পঞ্চমবারে জবাব দিল একটা ঘুম জড়িত কণ্ঠ, 'হালো?'

ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুকের মধ্যে। অন্য কেউ নয়, রবিনই ধরেছে।

'রবিন? আমি। কিশোর।'

'কিশোর! এত সকালে! ইস্, কি ঘুমটা যে ভাঙালে! একটা দারুণ স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা পালতোলা নৌকায় করে তুমি, আমি, মুসা সাগরে বেরিয়েছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে...'

'রবিন! ব্যাপারটা খুব জরুরী!' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর।

'ফিসফিস করে কথা বলছ কেন? কি হয়েছে?'

'একটা সাহায্য দরকার।'

'চলে আসতে বলছ ওশনসাইডে?'

'না না, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী। লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজ ঘাঁটতে হবে। হেরিং বীচে গিয়ে মিস্টার অ্যাডারসন নামে একটা লোকের পরিবার সম্পর্কে যত খবর ছাপা হয়েছে, বের করতে হবে। পারবে?'

'কিছু ঘটেছে?'

'ঘটেছে। সাংঘাতিক ঘটনা। এখন সব বলার সময় নেই,' ঘন ঘন রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। ভয়, ট্রিশ না এসে পড়ে। 'সব জানলে পিলে চমকে যাবে তোমার। হেরিং বীচ টাইমস পত্রিকাটা দিয়ে শুরু করবে। দুই বছর আগের পত্রিকাগুলো দেখলেই চলবে। তার পরেরগুলো সব দেখতে পারো, তবে আগেরগুলো দরকার নেই।'

'কি ঘটেছে, সেটা অন্তত বলবে তো?'

'এরিক আর বেকিকে দেখাশোনার জন্যে একটা মেয়েকে চাকরি দিয়েছে চাচী। মেয়েটা অদ্ভুত।'

'এ দুনিয়ায় কে অদ্ভুত নয়?' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে পুরোপুরি জেগে গেছে এখন সে। 'মুসা কোথায়? তোমার পাশেই আছে নাকি?'

'না, হোটেলে। বাড়িতে ঢোকাইনি ওকে। আমি চাইছি বাইরে বাইরে থেকেই তদন্ত করুক...'

ওপরতলায় নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। উঠে গেছে কেউ। ফোন রেখে দেয়া দরকার।

'কিশোর, শুনছ?' ওপাশ থেকে ভেসে এল রবিনের কণ্ঠ।

'শুনছি। রাখি, রবিন। সবাই উঠে পড়েছে।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কথা ভুলে গেছি,' রবিন বলল। 'মেরিচাচীর সুন্দরী বোনের মেয়েটা গিয়েছে তোমাদের ওখানে?'

থমকে গেল কিশোর। 'বোনের মেয়ে?'

'হ্যাঁ। তোমরা যাওয়ার পর পরই একটা মেয়ে গিয়েছিল তোমাদের রকি বীচের বাড়িতে। আমি তখন ও পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, ঢুঁ মেরে দেখে যাই তোমরা গেলে কিনা। মেয়েটা পড়ল সামনে। কাকে খুঁজছে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কথা বলল। আমি বললাম, তোমরা ওশনসাইডে বেড়াতে চলে গেছ।'

'ও দেখতে কেমন?' গলা কাঁপতে শুরু করেছে কিশোরের।

'খুব সুন্দরী...'

ঝটকা দিয়ে কানের ওপর থেকে রিসিভারটা সারিয়ে ফেলল কিশোর। ছ্যাঁকা লাগল কানে। প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। অবাক হয়ে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

রক্ত বেরোতে শুরু করল ছিদ্রগুলো থেকে।

ওর আঙুল, হাত বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। নিজেকেই বোঝাল, 'না না, রক্ত নয়। রিসিভারটা লাল বলেই মনে হচ্ছে রক্ত।'

কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, রক্তই।

রিসিভারের ভেতর শোনা যাচ্ছে রবিনের চিৎকার, 'কিশোর! কিশোর! কি হয়েছে?'

কানের ওপর রিসিভার ধরতে গেল আবার কিশোর। গরম ছ্যাঁকা লাগতে আবার সরিয়ে আনল। কোনমতে কানের কাছে ধরে রাখল। গরম আঁচ লাগছে। 'রবিন, অদ্ভুত কাণ্ড! প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে রিসিভারটা! কানে লাগালেই ছ্যাঁকা লাগে।...হ্যাঁ, জলদি বলো, মেয়েটা দেখতে কেমন!'

'খুব সুন্দরী!' জবাব এল। সেই সঙ্গে খিলখিল হাসি।

আতঙ্কে জমে গেল যেন কিশোর।

রবিনের কণ্ঠ নয় এটা। ট্রিশের।

কিন্তু কি করে সম্ভব? বাড়িতে তো ফোনের এক্সটেনশন নেই। একটামাত্র ফোন, রান্নাঘরেই আছে।

'আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়ো, কিশোর পাশা। সেটাই এখন ভাল হবে তোমার জন্যে।'

কানের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাল ট্রিশের খিলখিল হাসি। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন রিসিভারটা। জীবন্ত প্রাণীর মত ছটফট করছে। ধরে রাখতে পারল না কিশোর। হাত থেকে ছেড়ে দিল। মাটিতে পড়েও ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফালাফি করতে লাগল যন্ত্রটা। রক্তে মাখামাখি।

চোখ বড় বড় করে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

লাউডস্পীকারের মত ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ট্রিশের কণ্ঠ, 'মেয়েটাকে নিয়ে এত কৌতূহল কেন তোমার, কিশোর? ও দেখতে কেমন, কেন এত জানার আগ্রহ? তোমাকে আর কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে না, সময়মত মেয়েটাই তোমার কাছে হাজির হয়ে যাবে। তবে, মাই ডিয়ার কিশোর, সেটা তোমার জন্যে সুখকর হবে না মোটেও।'

দশ

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। দোতলায় উঠে হল ধরে ছুটল চাচা-চাচীর ঘরের দিকে।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল সে, 'চাচী, ওঠো! ফোনটার অবস্থা দেখে যাও!'

জবাব না পেয়ে দরজায় ঠেলা দিল। খুলে গেল পাল্লা। খালি ঘর।

বাইরে থেকে ঝনঝন আর নানা রকম ধাতব শব্দ কানে এল।

ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। অবাক হয়ে দেখল একটা টো ট্রাক এসে ওদের দোমড়ানো গাড়িটাকে গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে দেখছেন চাচা-চাচী। কখন বেরোলেন, টেরই পায়নি সে।

জানালার কাছ থেকে সরে আসতেই ছোট একটা টেবিলের ওপর ট্রিশের দেয়া ফোন নম্বর আর ঠিকানা লেখা কাগজটা চোখে পড়ল ওর। ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখল।

চাচীকে দিয়ে ট্রিশের রেফারেন্সগুলোতে আরেকবার ভালমত খোঁজ নেয়ানো দরকার। তবে বিকৃত টেলিফোন সেটটার অবস্থা দেখলে বোধহয় তার আর প্রয়োজন হবে না। ট্রিশকে বিদেয় করে দেবে চাচী।

নিচে নেমে সামনের দরজার দিকে যাওয়ার আগে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিল আবার রান্নাঘরে, ফোনটার অবস্থা দেখার জন্যে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

ফোনটা ওটার ক্রেডলে স্বাভাবিক ভাবে বসে আছে।

প্রচণ্ড হতাশায় আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে।

ঘটনাটা কি?

মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল ভয়ের শীতল শিহরণ।

মাথা কি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে আমার? ভাবল সে। ভুলভাল দেখছি? কিন্তু তাহলে খবরের কাগজের কাটিংটার ব্যাপারটা কি? ওটা তো সত্যি সত্যি পুড়েছে। তার প্রমাণ কার্পেটের পোড়া দাগটা। ওটা তো আছে।

এ সব কথা যদি চাচা-চাচীকে বলতে যায় এখন, পাগল হয়ে গেছে ভেবে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখবে।

ক্লাউড আর থান্ডারের কিচির মিচির। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। আনন্দে আছে পাখি দুটো। তারমানে বাড়িতে নেই এখন ট্রিশ। তাহলে আর আনন্দের গান বেরোত না ওদুটোর।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বাইরে বেরিয়ে এল। ছাউনি থেকে সাইকেলটা বের করে নিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে চলে এল সামনের দিকে।

ভাঙা গাড়িটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল টো ট্রাকটাকে।

চাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছিস এখন?'

'ভাল,' জবাব দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল কিশোর।

শহরে এসে একটা টেলিফোনের দোকান থেকে রবিনদের বাড়িতে ফোন করল আবার। ধরলেন রবিনের আম্মা। জানালেন, 'ও তো বেরিয়ে গেছে। বলল, পাবলিক লাইব্রেরিতে নাকি যাবে। তা তোমরা কেমন আছ?'

'ভাল।' বলে লাইন কেটে দিল কিশোর। কোনও ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না।

ফোনের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মুসার হোটেলে রওনা হলো।

এগারো

হোটেলের সামনে সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকল কিশোর। ওয়েইটিং রুমে বসে থাকতে দেখল মুসাকে। কিশোরকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে কোন রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ট্রিশ বিড়ালের খবর

কি?'

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, 'ওর কথা আর বোলো না। শুনলে বিশ্বাস করবে না।...চলো, বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

হাঁটতে হাঁটতে মুসাকে সব জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তোমাকে পাগল মনে হচ্ছে না আমার। আগের বার যখন পাগল হয়েছিলে, অন্য রকম আচরণ করতে।'

মুসার কথায় অনেকটা স্বস্তি পেল কিশোর। 'একটা কথাও মিথ্যে বলিনি, বিশ্বাস করো। প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে। কি করে ঘটল, এর কোন ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। কিন্তু ঘটেছে।'

'মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া উচিত,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এমন করে বলল মুসা, যেন ট্রিশ শুনে ফেলবে।

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কি ভাবে?'

'বের করতে হবে কোন একটা বুদ্ধি,' তারের জালের মত চুলগুলোকে হাত দিয়ে ডলে নিজের অজান্তেই আরও চ্যাপ্টা করে দিল মুসা। 'কাল থেকে বহু লোককে জিজ্ঞেস করেছি, ট্রিশ নামে কাউকে চেনে কিনা। ওকেও চিনল না, ওর আন্ট জিরা কিংবা তার মেয়ে শীলাকেও না।'

পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা টেনে বের করল কিশোর। 'এই যে দেখো, ঠিকানা আছে।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'এ বাড়িতে থাকে বলেছে? অসম্ভব! কালকেই সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ওখানে। বাড়ির কেয়ারটেকারের ছেলে প্রিটোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আমার। বহুদিন নাকি খালি পড়ে আছে বাড়িটা। অনেক বছর আগে কয়েকজন লোক খুন হয়েছিল ওখানে, তারপর থেকে আর কেউ টিকতে পারে না ওখানে। লোকে বলে ভূত আছে। বদনাম হয়ে গেছে বাড়িটার। কেউ আর থাকতে চায় না ওখানে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'বাড়িটা দেখতে চাও? হাতে সময় আছে? চলো তাহলে।'

'আছে। চলো। কিন্তু যাব কি ভাবে? বেশি দূরে?'

'হ্যাঁ, দূরেই। রেন্ট আ কার থেকে একটা গাড়ি ভাড়া নেয়া যেতে পারে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল, 'বেশ, চলো নিয়ে নেয়া যাক। হোটেলেই দেখলাম রেন্ট আ কারের অফিস।'

শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল না ওদের। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল। একটা পুরানো নীল গাড়ি ভাড়া নিয়েছে। পুরানো হওয়াতে ভাড়া কম। কিন্তু ইঞ্জিনটা মন্দ না। মোটামুটি নিঃশব্দেই চলে।

কয়েক মিনিট পর একটা গেটের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। বড়

একটা পুরানো বাংলো টাইপের বাড়ি দেখা গেল গেটের ওপাশে।

'বাপরে! চেহারা দেখেই তো মনে হচ্ছে পোড়ো বাড়ি! দিন দুপুরেই গা ছমছম করে,' কিশোর বলল।

'তাহলেই বোঝো,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'দু'জন মেয়েমানুষ একা একা থাকতে আসবে এখানে কোন্ সাহসে? তার ওপর যদি বাড়ির বদনাম থাকে?'

আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখল না কিশোর। একেবারে নির্জন।

'প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্যে কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা,' মুসা বলল। 'যে লোক বানিয়েছিল, বুঝে শুনেই বানিয়েছে। প্রিটোর কাছে শুনলাম, নিজে এসে মাঝে মাঝে থাকত। বাকি সময় টুরিস্টদের কাছে ভাড়া দিয়ে রাখত। নামবে নাকি?'

'হুঁ,' ঘাড় কাত করে বলল কিশোর, 'নামা যায়।'

গাড়িটা রাস্তার এক পাশে রেখে নেমে পড়ল মুসা। কিশোরও নামল। রাস্তার অন্য পাশে খাড়া নেমে গেছে ঢাল। ঢালের গায়ে বড় বড় পাথর দেখা গেল। নিচে পাহাড়ের দেয়ালের কাছে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ।

'কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দারুণ!'

'বোটে করে বেড়ানো যায়। একটা দ্বীপ আছে। নিয়ে গিয়েছিল প্রিটো। অনেক কিছু দেখিয়ে এনেছে।'

'বাপরে! একদিনেই অত? বহুত খাতির করে ফেলেছ দেখছি।'

হাসল মুসা। 'নাহলে তদন্ত করতাম কি করে? গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে লোকের সঙ্গে পরিচয় করতেই হয়।'

কিশোরও হাসল, 'আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ মনে হচ্ছে?'

আবার এসে গাড়িতে উঠল ওরা। কয়েক মিনিট চলার পর ঢালু হয়ে এল পাহাড়ী রাস্তা। একপাশে সাগর চোখে পড়ছে। আরও মিনিট পাঁচেক পর সৈকতের ধারে একটা ছোট কাঠের কেবিন দেখা গেল। সামনে সাইনবোর্ডে লেখা: এখানে বোট ভাড়া দেয়া হয়।

ওদের দেখে বেরিয়ে এল একজন লোক। কিশোরকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, মুসা, বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একটা বোট নেব?'

'প্রিটো এল না?'

'না, আমরাই এসেছি আজ।...ও কিশোর পাশা। রকি বীচ থেকে বেড়াতে এসেছে চাচা-চাচীর সঙ্গে।'

'ও। তা দেখো, কোন বোটটা নেবে।'

'কাল যেটা দিয়েছিলেন, সেটা নেই?'

'আছে।'

ঘরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এল লোকটা। হাসিমুখে একটা চাবি বাড়িয়ে দিল।

কিশোরকে নিয়ে জেটির দিকে এগোল মুসা। দশ-বারোটা নানা আকারের বোট বাঁধা রয়েছে ঘাটে। একটাতে গিয়ে উঠল সে। কিশোরকে উঠতে ডাকল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা। সেদিকে বোট ছোটাল সে।

দ্বীপটার কাছে আসতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। প্রচুর পাথর দেখা যাচ্ছে সৈকতে। ছোট একটা খাঁড়িতে বোট ঢোকাল সে। নোঙর ফেলল। লাফ দিয়ে বোট থেকে নামল সে আর কিশোর।

'এটা আসলে একটা উপদ্বীপ,' মুসা বলল। 'সরু এক চিলতে উঁচু জায়গা দিয়ে যুক্ত।'

গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগোল দু'জনে। তীর থেকে সামান্য দূরে বনের মধ্যে একটা কাঠের কেবিন। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'ওটা এক শিকারীর কেবিন। শীতকালে এসে থাকে। ফাঁদ পেতে শিয়াল ধরে। শিয়ালের চামড়ার ব্যবসা করে।'

কেবিনটার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে।

'ঢুকবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

দ্বিধা করল কিশোর। 'অন্যের ঘরে ঢুকব?'

'অসুবিধে নেই,' মুসা জানাল। 'কাল প্রিটোর সঙ্গে ঢুকেছি। শিকারী নাকি তার বন্ধু। এক মৌসুমে প্রিটোও এসে শিকারীর সঙ্গে ছিল কিছুদিন শিয়াল ধরা দেখেছে।'

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। একটা বড় চৌকি আছে। দু'জন ঘুমানোর উপযোগী। একটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল আছে। এক কোণে ভারী একটা কাঠের সিন্দুকও আছে।

ডালা তুলে দেখা গেল, তার মধ্যে চাদর, বালিশ, মশারি থেকে শুরু করে শাবল, বেলচা, ছুরি, হ্যারিকেন সব আছে। শিকারীর জিনিস। রেখে গেছে। শিকারে এলে তখন কাজে লাগে ওর।

'বেড়ায় ওটা কিসের দাগ?' আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'রক্ত নাকি?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। ট্রিশের হাত থেকে মুক্তির উপায়।'

আবার সিন্দুক খুলল সে। বড় একটা ছুরি বের করে এনে তুলে ধরল কিশোরের দিকে। 'ইচ্ছে করলে এটা ব্যবহার করতে পারো।'

'মানে!' চমকে গেল কিশোর।

মুসা বলল, 'ভয় লাগছে? বেশ। তুমি না করতে চাইলে নেই। আমিই করব।'

বারো

'কি বলছ তুমি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের।

বিচিত্র হাসি ফুটল মুসার মুখে।

'তুমি···তুমি ওকে খুন করতে বলছ!'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। হাসিটা বাড়ল। 'ট্রিশের ঘরে কোথাও রেখে দেবে এটা। ড্রেসারের ড্রয়ারে কিংবা ওরকম কোন জায়গায়। তারপর কোন ভাবে রাশেদ আঙ্কেল আর মেরিআন্টিকে সেটা দেখানোর ব্যবস্থা করবে। ট্রিশের ড্রয়ারে এতবড় ছুরি লুকানো দেখলে একটা সেকেন্ড আর ওকে থাকতে দেবেন না ওঁরা।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসার বুদ্ধিটা মন্দ না।

ছুরিটা ওর হাতে তুলে দিল মুসা।

ধারাল ফলাটার দিকে তাকিয়ে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল কিশোরের।

বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'এ কাজ করতেও ভয় লাগছে?'

'না, তা লাগছে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিন্তু মিথ্যে দোষে দোষী করে ওকে বিদেয় করার কথা ভাবতে নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে।'

'কাপুরুষ ভাবা যেত, যদি ও মানুষ হত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ট্রিশ ডাইনী। শয়তানের পূজা করে। ওকে এখন বাড়ি থেকে ভাগানোটাই আসল কথা। যে কোন কৌশলেই হোক।'

*

অনেকক্ষণ বনে-বাদাড়ে ঘোরাঘুরি করে আবার খাঁড়িতে বেরিয়ে এল ওরা। বোটে চাপল।

শহরে ফিরেও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না কিশোরের। বাড়ির কথা, ওখানে ট্রিশ আছে–এ কথা মনে পড়লেই দমে যাচ্ছে কিশোর। মনে চাপ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যেতেই হবে। কতক্ষণ আর বাইরে থাকবে?

একবার মনে হলো, হোটেলেই থেকে যায়। বাড়িতে ফোন করে দেবে মেরিচাচীকে। কিন্তু তাহলে আর ট্রিশের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে না। অদ্ভুত, জটিল একটা রহস্যের সমাধানও হবে না। অগত্যা মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলে চাপল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়ির গেটটা চোখে পড়তেই অস্বস্তি বোধটা বাড়ল তার। একটা অজানা ভয় চেপে ধরতে শুরু করল।

গেটের ভেতরে ঢুকল গাড়ি। দেখল, বাগানে এরিক আর বেকির সঙ্গে রয়েছে ট্রিশ।

কিশোরকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল ট্রিশ, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'বেড়াতে,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে ট্রিশের দিকে এগোল।

লাল একটা ঢোলা শার্ট গায়ে দিয়েছে ট্রিশ। পরনে সাদা প্যান্ট। চুলগুলো ছেড়ে দেয়া। সুন্দর লাগছে ওকে। সুন্দরী ডাইনী!–ভাবল কিশোর।

'তোমার খালার বাড়িটা দেখে এলাম,' বলল কিশোর। 'পাহাড়ের গায়ে, সাগরের ধারে। ওখানে তো মনে হলো ভূত ছাড়া আর কিছু নেই। একজন মানুষও দেখলাম না।'

'মাত্র কয়েক দিন আগে বাড়িটা কিনেছে আন্ট জিরা,' সামান্যতম মলিন হলো না ট্রিশের হাসি। 'কিন্তু এখনও ওঠেনি ওখানে। মেরিআন্টিকে ঠিকানাটা যখন দিয়েছিলাম, মনে করেছিলাম দু'এক দিনের মধ্যেই ওই বাড়িতে উঠে যাবে আন্ট জিরা। কিন্তু একটা ভেজাল হয়েছে। বাড়ি বদলাবদলি নিয়ে কি রকম ঝামেলা বাধে, জানোই তো।'

'এখন কোথায় আছেন তোমার আন্ট জিরা?'

'প্যাসিফিক কাউন্টিতে। ওশনসাইডের পরের শহরটাই।'

'নাকি হেরিং বীচে?'

'উঁহু, ওশনসাইডেই।' দমল না ট্রিশ। আচমকা কিশোরের পকেটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ওটা কি? ছুরি মনে হচ্ছে?'

ঝট করে পকেটের দিকে তাকাল কিশোর। প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে ছুরির মাথাটা। বড় বলে পুরোপুরি জায়গা হয়নি পকেটে। অসাবধান হওয়ার জন্যে মনে মনে নিজেকে একশো একটা গালি দিল কিশোর। শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ছুরি।...যাই।' চুরি করে ধরা পড়ে গেছে যেন এমন ভঙ্গিতে তাড়াহুড়ো করে সরে এল সেখান থেকে। সদর দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। ঘরে ঢোকার আগে ফিরে তাকাল একবার। দেখল, তখনও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রিশ।

* *

ঘরে ঢুকল কিশোর। ট্রিশ বাইরে। সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বরং এত সহজে ট্রিশের ঘরে ছুরি লুকানোর সুযোগ পেয়ে যাবে কল্পনাই করেনি।

চাচা-চাচী কাউকে দেখল না। বোধহয় নিজেদের বেডরুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একটা সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে ছুটতে ছুটতে এসে ট্রিশের ঘরে ঢুকল কিশোর। টান দিয়ে খুলল ড্রেসারের ওপরের ড্রয়ারটা। সুন্দর ভাঁজ করে কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখেছে ট্রিশ।

ব্যাগ থেকে ছুরিটা বের করল কিশোর। হাত কাঁপছে। জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের আলোয় ঝিক করে উঠল ছুরিটা।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল কিশোরের। জিনিসটা ধরে রাখতে ভাল লাগছে না তার।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল এ সময়। ছুরির ডগায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল এক বিন্দু রক্ত।

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না।

চোখের আরও কাছে নিয়ে এল ছুরিটা, ভাল করে দেখার জন্যে।

ওকে চমকে দিয়ে বিন্দুটা যেখানে ফুটেছে সেখান থেকে আচমকা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল তাজা রক্ত।

আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল সে।

ছুরি থেকে রক্ত বেরিয়েই ক্ষান্ত হলো না। ছরছর করে তার সমস্ত শরীরে ছিটানো শুরু করল।

তেরো

আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল কিশোর। ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলল ড্রয়ারের মধ্যে।

ফোয়ারার মত রক্ত ছিটাতে ছিটাতে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ছুরিটা।

অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল কিশোর। বরফের মত জমে গেছে যেন। ছুরি থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে ট্রাউজারের কাপড়গুলো।

'অসম্ভব! এ অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল সে। স্বর বেরোতে চাইছে না। 'এ হতে পারে না!'

কখন যে দৌড়াতে শুরু করল নিজেও বলতে পারবে না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল লিভিং রূমে। শূন্য ঘর।

পাখির খাঁচাটার দিকে চোখ পড়তে আরেকটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

এক পা এগোল। আরও এক পা। দাঁড়িয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠল আবার।

থরথর করে কাঁপছে।

খাঁচার মধ্যে পড়ে রয়েছে ক্লাউড আর থান্ডার। দুটোরই গলা কাটা।

ঝটকা দিয়ে নিজের দুই হাত গলার কাছে উঠে এল কিশোরের। যেন তার গলাও কাটতে আসবে, সে-জন্যে গলা বাঁচাচ্ছে।

কিশোরের চিৎকার শুনে ওপর থেকে দৌড়ে নেমে এলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, কি হয়েছে তোর? সারা গায়ে এত রক্ত কিসের?'

গলা থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে খাঁচার দিকে দেখাল কিশোর।

'সর্বনাশ! এ কি করেছিস?'

চুপ করে রইল কিশোর। ভারী নীরবতা বিরাজ করতে থাকল ঘর জুড়ে।

সামনের দরজা দিয়ে কেউ ঢুকল বলে মনে হলো কিশোরের। দ্রুত চলে

গেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। কিন্তু তাকাল না কিশোর। কে এল, সেটা নিয়েও কোন কৌতূহল নেই। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। কোন অনুভূতিও যেন নেই।

মেরিচাচী বললেন, 'আমার মাথায় ঢুকছে না, কিশোর, এমন একটা কাণ্ড তুই করলি কি ভাবে?'

চাচীর দিকে তাকাল কিশোর। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

খানিক পরেই দুপদাপ করে দোতলা থেকে নেমে এল ট্রিশ। হাতে সেই ছুরিটা। রক্তে মাখামাখি।

'আন্টি,' চিৎকার করে উঠল ট্রিশ। ছুরিটা তুলে দেখাল। 'আমার ড্রয়ারের মধ্যে পড়ে ছিল এটা। দেখুন, রক্ত। আমার কাপড়-চোপড় সব শেষ। সব কিছুতে রক্ত লেগে গেছে…'

কিশোরের রক্ত লেগে থাকা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরে গেল পাখির খাঁচার দিকে।

'এ কি!' ঝট করে ট্রিশের একটা হাত মুখের কাছে উঠে গেল। 'পাখিগুলো…পাখিগুলো…' চোখের পাতা আধবোজা করে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'আমার ড্রয়ারে রক্ত…তারমানে পাখিগুলোর?'

'খবরদার, আর ভালমানুষ সাজতে হবে না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল। 'ভান করে লাভ নেই। তুমি এ কাজ করেছ। তুমি। কি ভাবে করেছ, জানি না। কিন্তু এটা জানি, তুমিই খুন করেছ পাখি দুটোকে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ট্রিশের। 'কি বলছ তুমি, কিশোর? আমাকে তুমি দেখতে পারো না, জানি। কিন্তু এত বড় একটা দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে কল্পনাও করতে পারিনি।'

আরেকবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করল কিশোর। কোনমতেই থামাতে পারল না নিজেকে। পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান! ডাইনী! বেরো আমার বাড়ি থেকে! বেরো! এক্ষুণি!'

হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল বেকি আর এরিক। চেঁচামেচি কানে গেছে ওদেরও। খেলা বাদ দিয়ে ছুটে এসেছে।

ওপর থেকে নেমে এলেন রাশেদ পাশা। কিশোরের কথা কানে গেছে। 'চুপ কর, কিশোর!' ধমকে উঠলেন তিনি। 'আর একটা কথাও বলবি না বলে দিলাম।'

'দেখো, চাচা, দোহাই তোমাদের!' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, 'আমার কথা শোনো! বিশ্বাস করো! ট্রিশ একটা ডাইনী! সে যে কি সব কাণ্ড করছে…'

তার কথা শুনলেন না রাশেদ পাশা। স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'কি হয়েছে?'

'পাখি দুটোকে জবাই করা হয়েছে,' মৃদু কণ্ঠে স্বামীকে জানালেন মেরিচাচী। 'ছুরিটা পাওয়া গেছে ট্রিশের ড্রয়ারে।'

কিশোরের রক্তমাখা কাপড়ে চোখ বোলালেন রাশেদ পাশা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আর দেরি করা যায় না। কালই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

চোদ্দ

পরদিন সকাল। ডাক্তার রবার্টসনের অফিসে বসে আছে কিশোর।

ডা. রবার্টসন মানসিক রোগের চিকিৎসক। বয়েস ষাট। চুল পেকে গেছে প্রায় সবই। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখলে মনে হয় ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন।

কিশোরকে প্রায় জোর করে ধরে এনেছেন তার চাচা-চাচী।

কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না ডাক্তার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন। দুই হাত কোলের ওপর। কিশোরের কথা শুনছেন। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন।

প্রথমে কথা বলতে চায়নি কিশোর। কিন্তু একবার শুরু করার পর আর থামতেও চাইছে না। পুরো ঘটনাটা গড়গড় করে আউড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চাইছে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। ট্রিশ আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে ডাক্তারকে।

কথা শেষ করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল জবাবের আশায়।

'হুঁ,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন অবশেষে ডাক্তার। 'বহু কাণ্ডই ঘটে গেছে।'

'তারমানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?' আশা বাড়ল কিশোরের।

'করেছি। তোমার মনে হয়েছে, যা যা ঘটেছে সবই বাস্তবে, তাই না?' জবাব দিলেন ডাক্তার।

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। ঠাস করে এক চড় মারা হলো যেন তাকে।

ডাক্তার ওকে মিথ্যুক ভাবছেন না। ভাবছেন বদ্ধ পাগল।

'তুমি কি বুঝতে পারছ,' কোমল স্বরে বললেন ডাক্তার, 'তোমার পাগল হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত তোমার চাচা-চাচী? আগেও একবার হয়েছিলে তুমি, খুনে মগজ হয়ে গিয়েছিল, সে-জন্যেই তাঁরা এত বেশি চিন্তিত।'

'পাগল আমি হইনি, ডাক্তার সাহেব,' মরিয়া হয়ে বলল কিশোর। 'সত্যিই এ সব ঘটনা···'

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, কিশোর,' ডাক্তার বললেন, 'ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার আসলে কি হয়েছে শোনো। ট্রিশ আসার পর থেকেই

তোমার মনে হচ্ছে তোমার চাচা-চাচী আর আগের মত ভালবাসেন না তোমাকে। তাঁদের সব ভালবাসা চলে গেছে ট্রিশের ওপর। ট্রিশের সঙ্গে তাঁদেরকে ভাল আচরণ করতে দেখে তাকে ঘৃণা শুরু করেছ তুমি...'

হতাশ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'আপনিও বুঝতে পারলেন না, ডাক্তার সাহেব। একটা ভুল ধারণা করে বসলেন। মস্ত বড় ভুল।'

চেয়ার থেকে উঠে টেবিল ঘুরে এসে কিশোরের কাছে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ওর কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তুমি বাইরে যাও। তোমার চাচা-চাচীকে পাঠিয়ে দাও। তাঁদের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টানতে টানতে ফিরে এল ওয়েইটিং রূমে। অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন চাচা-চাচী। মুখ তুলে তাকালেন।

'ডাক্তার সাহেব যেতে বলেছেন তোমাদের,' কিশোর বলল।

'কি হয়েছে? তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন চাচী।

'জানি না,' মুখ কালো করে রাখল কিশোর।

ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন চাচা-চাচী। বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। কি বোঝাচ্ছেন তাঁদেরকে ডাক্তার? ওকে ঘরে তালা আটকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন?

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারছে না।

সময় কাটছে। কিশোরের মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছেন চাচা-চাচী।

অবশেষে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন দু'জনে। থমথমে চেহারা। তাঁদের পেছনে বেরোলেন ডাক্তার।

'কিশোর,' কোমল স্বরে বললেন তিনি, 'পাঁচ দিন পর আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে তুমি, ঠিক আছে? তার আগেই যদি আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করো, ফোন কোরো। রিসিপশন থেকে আমার কার্ড নিয়ে যাও। যা যা করতে বলেছি, মনে থাকে যেন। সমস্ত দুশ্চিন্তা মগজ থেকে বের করে দিয়ে শরীরটাকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করবে। ঠিক হয়ে যাবে সব।'

প্রবেশ মুখের কাছে ছোট ডেস্কে বসা মেয়েটার কাছ থেকে ডাক্তারের ফোন নম্বর লেখা কার্ড নিয়ে নিল কিশোর। মেজাজ খারাপ লাগছে তার, শুধু শুধু চাচা-চাচী এতগুলো টাকা ডাক্তারের পেছনে খরচ করতে এসেছেন বলে। ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার! কিচ্ছু ধরতে পারেনি!

'আমার সম্পর্কে কি বলেছে হাঁদা বুড়োটা?' বাইরে বেরিয়ে ওদের গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যা ঠিক তা-ই বলেছেন,' রাশেদ পাশা বললেন। 'প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের

মধ্যে আছিস তুই। ভাবছিস, আমরা তোর পর হয়ে গেছি। অন্যের মেয়েকে তোর জায়গায় ঠাঁই দিচ্ছি বলে তার ওপর ঘৃণা জন্মেছে তোর।'

'আমাকেও এ কথাই বলেছে। কিন্তু মোটেও ঠিক নয় তার কথা।'

'তোর অবচেতন মনে চলছে এ সব, কিশোর,' মেরিচাচী বললেন, 'সে-জন্যেই তুই বুঝতে পারছিস না। ডাক্তার সাহেব ঠিকই ধরে ফেলেছেন। এত লেখাপড়া তো আর শুধু শুধু করেননি। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা কর তুই, কিশোর। মগজটাকে শান্ত করার চেষ্টা কর। চিন্তা-ভাবনা সব দূর করে দে। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'হুঁ, হবে! তুমিও তো দেখি ডাক্তারটার মত কথা বলছ! তোতাপাখির শেখানো বুলি।'

গাড়ির পেছনের সীটে উঠে বসল কিশোর। হেলান দিয়ে চোখ বুজল। আগের রাতে ঘুম হয়নি ভাল। ঘুমানোর চেষ্টা করল এখন। গাড়িতে বসে ঘুমানোটা তার ছোট বেলার অভ্যাস।

কিন্তু ঘুম এল না এখন। কয়েক মিনিট পর চাচীর ফিসফিসে ডাক কানে এল, 'কিশোর, ঘুমিয়েছিস?'

জবাব দিল না কিশোর। চাচীর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগছে না আর। চোখ মেলল না।

'ঘুমিয়ে পড়েছে,' নিচুস্বরে স্বামীকে বললেন মেরিচাচী। 'আচ্ছা, ট্রিশকে বিদেয় করে দিলে কেমন হয়?'

'এখন আর সম্ভব না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন চাচা। 'ডাক্তার কি বললেন শুনেছ।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেরিচাচী। 'ট্রিশকে বিদেয় করে দেয়ার অর্থ হলো কিশোরের মিথ্যে সন্দেহকে সাপোর্ট দেয়া। সেটা করাটা ঠিক হবে না, তাই না? কিশোরকে ধারণা দেয়া চলবে না কোনমতেই, যে তার কথাই ঠিক—ট্রিশ আমাদের জন্যে একটা হুমকি।'

'হ্যাঁ,' রাশেদ পাশা বললেন। 'ট্রিশকে বিদেয় করে দিয়ে লাভ নেই। ট্রিশ গেলে অন্য কাউকে রাখতে হবে আমাদের। তখন তার সঙ্গেও একই আচরণ শুরু করে দেবে কিশোর। তাকেও শত্রু ভেবে বসবে। তার পাগলামি নতুন করে শুরু করবে আবার।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'তারচেয়ে ট্রিশই থাক। নিজের আচরণ বদলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিক কিশোর।'

'হ্যাঁ। কিশোরের ভালর জন্যেই এখন ট্রিশকে আর বিদেয় করা যাবে না।'

পেছনে বসে সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কিশোর।

চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করছে, কেন বুঝতে পারছ না তোমরা, ট্রিশ একটা অশুভ হুমকি আমাদের জন্যে। হাঁদা ডাক্তারটার বানোয়াট কথাগুলো কেন বিশ্বাস করছ তোমরা!

ট্রিশ অশুভ। ট্রিশ শয়তান। প্রচণ্ড তার ক্ষমতা। কোন সন্দেহই নেই

তাতে।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে চলল কিশোর। কি করব? কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। সবাইকে বুঝতে দিতে হবে, ডাক্তারের কথা মেনে নিয়েছে সে। তাতে চাচা-চাচীকে ঘাড় থেকে নামানো যাবে। ট্রিশকেও অসতর্ক করা যাবে।

এতক্ষণে চোখ মেলল কিশোর। বড় করে হাই তুলল। হাত-পা টানটান করল।

বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে গাড়ি থামতে সবার আগে নেমে পড়ল কিশোর। ঘরে ঢুকল।

হলঘরে মেঝেতে বসে বেকি আর এরিকের সঙ্গে লুডো খেলছে ট্রিশ। গোলাপী শার্ট আর প্যান্টে চমৎকার লাগছে ওকে। চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে গোলাপী রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। নিষ্পাপ মুখটা দেখে এখন কে বলবে তার মধ্যে বাস করে এক ভয়াবহ শয়তান।

'আরি, এসে গেছ,' কিশোরকে দেখে বলে উঠল ট্রিশ। 'তা কেমন কাটল?'

'ভাল,' হাসি হাসি কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'ট্রিশ, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। কোন অসুবিধে আছে?'

'আরে না না, কি বলো, অসুবিধে কি?...এই এরিক, বেকি, ঘুঁটি নাড়বে না। কোনটা কোথায় আছে মনে আছে কিন্তু আমার। চুরি করে সুবিধে করতে পারবে না।'

'ঠিকই পারব। চুরি করলে তুমি ধরতেই পারবে না,' জবাব দিল এরিক। 'তবে আমি করব না।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'কিশোর ভাই, তোমার অসুস্থতা একটু কমেছে?'

বেচারা এরিক। ওর জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। ও ভাবছে সত্যি সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে সে।

পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল কিশোর আর ট্রিশ। চমৎকার বাতাস বইছে। চুল উড়তে লাগল দু'জনের।

'ট্রিশ,' কিশোর বলল, 'ডাক্তার বলেছেন, দোষটা আমার মগজে। এখন বুঝতে পারছি, অকারণে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। সত্যি, এ সব কি করলাম আমি গত কদিন ধরে! এত খারাপ লাগছে আমার...'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। নিজের অভিনয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

'না না, ঠিক আছে, ট্রিশ বলল। 'এতে দুঃখ পাওয়ার কি হলো। এখন থেকে বন্ধু হয়ে যেতে পারি আমরা। এ কথা বলার জন্যেই আমাকে এখানে ডেকে এনেছ। ঘরে বললেও তো পারতে। যাকগে। চলো, লুডো খেলি।'

'না, এখন ভাল লাগছে না। মাথার মধ্যে কেমন করছে। শরীরটাও অবশ অবশ লাগছে। শুয়ে থাকিগে।'

'ঠিক আছে,' ট্রিশ বলল। 'যাও। ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে অনেক ভাল লাগছে।'

নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। কাপড়-চোপড় ছেড়েই সোজা চিত হয়ে পড়ল বিছানায়।

মেরিচাচীর ডাকে ঘুম ভাঙল তার

উঠে বসল বিছানায়।

জানালা দিয়ে আসছে ধূসর আলো

দিনের বেশির ভাগটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

'কিশোর, ওঠ,' মেরিচাচী বললেন। 'তোর ফোন।'

'মুসা?'

'না, রবিনের আম্মা।'

মুহূর্তে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল কিশোরের। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'আন্টি? কি খবর? রবিন কোথায়?'

'সেটা বলার জন্যেই তো ফোন করলাম,' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন রবিনের আম্মা।

শঙ্কিত হলো কিশোর। 'কি হয়েছে ওর? খারাপ কিছু?'

'খারাপ মানে! ও এখন হাসপাতালে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। 'কি হয়েছে ওর?'

পনেরো

'গতকাল লাইব্রেরিতে হঠাৎ করেই একটা পত্রিকার ফাইলের ওপর ঢলে পড়ে সে,' রবিনের আম্মা জানালেন। 'নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে।'

'বলেন কি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। রিসিভার চেপে ধরল আঙুল 'তারপর?'

'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার কিছু বুঝতে পারছেন না কেন এমন হলো। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখন।'

পেটের মধ্যে যেন খামচি দিয়ে ধরল কিশোরের। ট্রিশের কাজ, কোন সন্দেহ নেই তার। আগের দিন ভোরবেলা রবিনের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রিশ শুনে ফেলেছে। তারপর কোন অদ্ভুত উপায়ে ফোনের লাইনকে মীডিয়াম বানিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ অবস্থা করেছে রবিনের।

'কিশোর, শুনতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলেন রবিনের আম্মা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্টি। সরি। এতটাই খারাপ লাগছে, কি বলব বুঝতে পারছি

না।'

'হ্যাঁ, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তোমাকে ফোন করার আরেকটা কারণ, তুমি কি জানো, কি খুঁজতে পত্রিকার অফিসে গিয়েছিল সে?'

'জানি। কিন্তু তার সঙ্গে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোনোর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না,' আসল জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর। দিয়েও কোন লাভ নেই। বিশ্বাস করবেন না মিসেস মিলফোর্ড। আর সবার মত তিনিও তাকে পাগল ভেবে বসবেন। কাঁপতে শুরু করেছে সে। হাতটা এত কাঁপছে, রিসিভার ধরে রাখতে পারছে না ঠিকমত।

'ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েনি তো তোমার বন্ধু?' জানতে চাইলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'প্রশ্নই ওঠে না। কোন রকম বদভ্যাস নেই রবিনের।'

'সেটা তো আমিও জানি। তবু জিজ্ঞেস করলাম, বলা তো যায় না—কোন অসৎসঙ্গে পড়ে যদি···যাকগে, তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম।···রাখি এখন?'

'ঠিক আছে, আন্টি। কি হয় জানাবেন। আমি খুব দুশ্চিন্তায় রইলাম।'

'জানাব।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা ক্রেডলে রাখতে গিয়ে দেখল অতিরিক্ত হাত কাঁপছে। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মগজে। রবিনের এই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল সে, পুরানো খবরের কাগজ ট্রিশের জন্যে বিপজ্জনক। ওর ঘরে ঢুকে বাকি কাটিংগুলো দেখতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। যে করেই হোক। ওই কাটিঙেই রয়েছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব এবং সূত্র। ট্রিশের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে আগে ওর সম্পর্কে জানতে হবে ভালমত। জানতে হবে ওর আসল পরিচয়।

রান্নাঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, কি হয়েছে তোর? এত কাঁপছিস কেন?'

'চাচী, রবিন হাসপাতালে,' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

অবাক হলেন মেরিচাচী। 'কি হয়েছে ওর?'

'শিওর না, চাচী। ডাক্তাররাও কিছু বুঝতে পারছে না।'

আর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোর। যদি বলে ট্রিশকে সন্দেহ করছে সে, সকালে উঠেই ধরে নিয়ে রওনা হবে আবার ডাক্তারের কাছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রিশের সঙ্গে নাকি ভাব হয়ে গেছে তোর?'

'কে বলল?'

'ট্রিশ।'

'হ্যাঁ। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি আমি।'

'ভাল করেছিস।'

'ওকে জানালাম, ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার ভুলটা ভেঙেছে বুঝতে

পারলাম, আমার নিজের মগজের মধ্যেই দোষ। চিন্তা কোরো না, চাচী। ট্রিশের সঙ্গে আর বাধবে না আমার।'

খুশি হতে পারলেন না মেরিচাচী। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'না বাধলেই ভাল।'

'না, চাচী, বাধবে না। বলছি তো।'

'ঠিক আছে। ও, কিশোর, আমি আর তোর চাচা একটু বেরোব আমার এক পরিচিত লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। পার্টি দিচ্ছে বাড়িতে দাওয়াত করেছে আমাদের। ফিরতে দেরি হবে। বলা যায় না, রাতে আজ আর না-ও ফিরতে পারি। আজকে তো ট্রিশের ছুটি। আমরা যতক্ষণ না আসি এরিক আর বেকিকে দেখে রাখতে পারবি না?'

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। ট্রিশ এসে দাঁড়াল দরজায়। 'কিশোরের শরীর খারাপ যখন, থাক না আন্টি, আজকে নাহয় সাপ্তাহিক ছুটিটা না-ই নিলাম।'

'না না, আমি ঠিক হয়ে গেছি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। উষ্ণ হাসি হাসল ট্রিশের দিকে তাকিয়ে। 'আমিই ওদের দেখতে পারব। তোমার ছুটি তুমি নিয়ে নাও। ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারো।'

ট্রিশকে বিদেয় করতে চাওয়ার দুটো কারণ। তার ঘর খুঁজে বাকি কাটিংগুলো পড়তে পারবে। সেই সঙ্গে যে দুটো ফোন নম্বর দিয়েছে সেগুলোতে আরেকবার ফোন করার চেষ্টা করে দেখতে পারবে।

'তা ছাড়া,' কিশোর বলল, 'ওদের তো ঘুমানোর সময়ই হয়ে গেছে। তেমন কিছু করা লাগবে না আমার। তা সন্ধেটা তুমি কি করে কাটাতে চাও, ট্রিশ?'

'ভাবিনি এখনও,' ট্রিশ জবাব দিল। 'তোমার শরীরটা খারাপ, অনেক ধকল গেছে, যদি চাও তো তোমাকেও সঙ্গ দিতে পারি।'

'যাক, মনে হচ্ছে মিলটা হয়েই যাচ্ছে দুজনের,' হেসে বললেন মেরিচাচী। ট্রিশের দিকে তাকালেন, 'তাহলে নিশ্চিন্তে বেরোতে পারি এখন আমি আর তোমার আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে যান।'

'অকারণে আমার জন্যে তোমার ঘরে বসে থাকার দরকার নেই, ট্রিশ' কিশোর বলল। 'এরিক আর বেকিকে আমি সামলাতে পারব।'

'বেশ,' ট্রিশ বলল, 'বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসি ওদের। ঘুমানোর আগে আমাকে না দেখলে শেষে ঘুমাতেই চাইবে না। দু-দিনেই নেওটা হয়ে গেছে।'

আহা, ন্যাকা! ট্রিশের কথা শুনে আর ভঙ্গি দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল কিশোরের। কোনমতে মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল সে।

তাড়াহুড়া করে চলে গেল ট্রিশ।

কিশোরের কপালে চুমু খেলেন মেরিচাচী। 'তোরা দুজনে মিল করে নিচ্ছিস, একটা ভার নেমে যাচ্ছে আমার মাথা থেকে। এত খুশি লাগছে

আমার। ট্রিশ যদি থাকেও ঘরে, দেখিস, ঝগড়া-টগড়া করিসনে আর।'

'না, করব না।'

কয়েক মিনিট পর রাশেদ পাশা ও মেরিচাচী গাড়িতে করে চলে গেলেন। নিজের ঘরে ফিরে চলল কিশোর। যাওয়ার সময় এরিক ও বেকির ঘরটা পড়ে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছে দুজনকে ট্রিশ।

তারমানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে ট্রিশকে। এই সুযোগে ফোনটা করে ফেলা যায়। নিজের ঘরে ঢুকে, ট্রিশের দেয়া ফোন নম্বর লেখা কাগজটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল আবার কিশোর। ফিরে চলল রান্নাঘরে। এরিকদের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল ট্রিশের পড়ার শব্দ।

রান্নাঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। দ্বিতীয় নম্বরটাতে ফোন করল, যেটাতে রিংই হয় না।

একবার। দুবার। তিনবার। পর পর সাতবার চেষ্টা করল কিশোর। আগের মতই অবস্থা। রিং হলো না।

'হুঁ, এটা আর কোনদিনই বাজবে না,' আনমনে মাথা দুলিয়ে বিড়বিড় করে অন্য নম্বরটার বোতাম টিপতে শুরু করল কিশোর। যেটা সব সময় বিজি পেয়েছে।

এবার উল্টো ফল ঘটল। একবার বাজতেই তুলে নিল রিসিভার ছেলেকণ্ঠে জবাব এল, 'হালো?'

'হ্যালো!' চমকে গেল কিশোর। জবাব পাবে আশা করেনি। 'আমি ট্রিশ অ্যান্ডারসনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে ফোন করেছি। এ নাম্বারটা ট্রিশই দিয়েছে আমাদের।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওপাশের ছেলেকণ্ঠ। ভীত মনে হচ্ছে কণ্ঠটাকে। 'আমি মিস্টার ব্রনসনের প্রতিবেশী। আমি আর আমার বাবা ঢুকেছি এ বাড়িতে। অনেক দিন ব্রনসনদের কোন খোঁজ নেই, দেখা পাচ্ছি না। তাদের ছেলেটাকেও দেখছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম, বেড়াতে গেছে সবাই। কিন্তু আজকে সামনের দরজাটা হাঁ হয়ে খুলে থাকতে দেখে কৌতূহল হলো। তাই দেখতে এসেছি। দরজায় তালা ছিল না। বোধহয় বাতাসেই খুলে ফেলেছে।' একটু থামল ছেলেটা। 'বাড়িতে ঢুকে কি দেখেছি জানো? বললে বিশ্বাস করবে না!' গলা কেঁপে উঠল ছেলেটার। 'উহ্, কি ভয়ানক দৃশ্য! তিনটা লাশ···বীভৎস!···দুর্গন্ধে বমি আসছে আমার···বাবা পুলিশকে ফোন করছে মোবাইলে···'

টেলিফোনে ভেসে এল একজন লোকের গলা, 'কে রে, টবি?'

'ট্রিশের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে, বাবা!' জবাব দিল লাইনে থাকা ছেলেটা।

'ছাড়! জলদি ছেড়ে দে!' ধমকে উঠল পুরুষ কণ্ঠ।

'না না, প্লীজ!' অনুরোধ করল কিশোর। 'ছেড়ো না! আমার কথা

শোনো…'

'ট্রিশ তোমাকে এ নম্বর দিয়েছে? ও কোথায় এখন, জানো?' টবি জিজ্ঞেস করল।

'জানি। আমাদের এখানে। দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেখাশোনার জন্যে রাখা হয়েছে ওকে…'

'তোমাদের বাড়িতে! মিস্টার ব্রনসনের ছেলেকে দেখাশোনার জন্যেও ওকেই রাখা হয়েছিল। ছেলেটার পচা বিকৃত মুখটা যদি এখন দেখতে। নাম কি তোমার?'

'কিশোর।'

'জলদি ভাগো, কিশোর! যদি বাঁচতে চাও! সবাই পালাও তোমরা! এক্ষুণি!'

'কেন? কেন পালাব?…হালো!…হালো!'

কেটে গেছে লাইন।

ষোলো

নীরব রিসিভারটা চোখের সামনে নামিয়ে আনল কিশোর। বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

দরজার কাছে শব্দ শুনে ধড়াস করে উঠল তার বুক। চমকে উঠল ভীষণ ভাবে। ফিরে তাকাল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। 'কি হয়েছে ফোনটার?'

'না না, কিছু হয়নি,' তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিল কিশোর। 'একজনকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। তারপর মনে হলো, থাক।'

'কাকে? রবিনকে?'

কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। 'ওর কথা তুমি জানলে কি করে?'

নির্বিকার থাকল ট্রিশ। রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল। 'আন্টি বলেছেন।'

'চাচী! রবিনের কথা তোমাকে বলতে যাবে কেন চাচী?'

'বলেছেন। কথায় কথায়।'

ট্রিশ যে মিথ্যে বলছে, তার বলার ভঙ্গিতেই বুঝতে পারল কিশোর।

রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলে পানির বোতল বের করল ট্রিশ। ধীরে সুস্থে পানি ঢালতে শুরু করল গেলাসে।

টবির কথা কানে বাজতে লাগল কিশোরের: জলদি ভাগো, কিশোর! যদি বাঁচতে চাও! সবাই পালাও তোমরা! এক্ষুণি!

'আমি যাই।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এরিক আর বেকিকে···আর ভাবতে চাইল না।

মগজে চিন্তার ঝড় বইছে। তিনটা অপরিচিত বিকৃত লাশ কল্পনায় ভেসে উঠল। ওগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখল আরও দুটো—এরিক আর বেকি। এবং তারপর আরও তিনটে···

দৌড়ে এসে দাঁড়াল এরিকদের ঘরের সামনে। দেখল এরিক আর বেকি ভালই আছে। এরিকের হাতে একটা কমিকের বই। পাশের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে বেকি।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন কিশোরের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'এরিক, তোরা ভাল আছিস?'

'ভাল থাকব না কেন?' অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল এরিক। কিশোর বুঝতে পারল, তাকে এখনও পাগল ভাবছে এরিক।

'কিশোর ভাই, ট্রিশ আপা কই?' এরিক জিজ্ঞেস করল। 'আমার জন্যে দুধ আনতে গেছে বলে গেল। এত দেরি করছে কেন?'

'রান্নাঘরে,' জবাব দিল কিশোর। 'মনে হয় দুধ বানাচ্ছে।'

টবির কথা কি শোনা উচিত? ভাবছে কিশোর।

বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে এরিক আর বেকিকে?

কোথায় যাবে?

চাচা-চাচীর কাছে চলে যেতে পারে। কিন্তু তাতে আরও খেপে যাবেন তাঁরা। সবাইকে সহ আবার বাড়ি ফিরে আসবেন। কিশোরকে ধরে নিয়ে যাবেন ডাক্তারের কাছে। মাঝখান থেকে ট্রিশের সঙ্গে তার ভাব করার অভিনয়টা যাবে ফাঁস হয়ে।

উঁহু, ওদেরকে বের করে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। বরং আজ রাতে ট্রিশকেই বিদেয় করার চেষ্টা করতে হবে। তারপর খবরের কাগজের কাটিংগুলো বের করে দেখাবে চাচা-চাচীকে। ওগুলো পড়লে আর কিশোরের কথায় অবিশ্বাস করতে পারবেন না তাঁরা। এ কাজে মুসার সাহায্য দরকার তার। হোটেলে ফোন করতে চলল কিশোর।

রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, ট্রিশের হাতে একটা ছোট প্যাকেট। সেটা থেকে বাদামী রঙের পাউডার ঢালছে দুধের গ্লাসে।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি বেড়ে গেল কিশোরের। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল।

কি রয়েছে প্যাকেটে?

বিষ?

ওই দুধ কোনমতেই এরিককে খেতে দেয়া যাবে না।

ভারী দম নিয়ে ঠেলে পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলল কিশোর। ট্রিশের

সামনে এসে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? কি সিদ্ধান্ত নিলে?'

'কিসের সিদ্ধান্ত?' ভুরু নাচাল ট্রিশ।

'ওই যে, তোমার ছুটির। রাতটা কি করে কাটাবে?'

'কিছুই ঠিক করিনি,' জবাব দিল ট্রিশ। 'কোথায় আর যাব একা একা। তারচেয়ে ঘরে বসে বসে লেখার চেষ্টা করিগে।'

'লেখা মানে?'

'গল্প লিখছি। পত্রিকায় পাঠাব। শেষ হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টা দু'তিনেক খাটলেই শেষ হয়ে যাবে।'

ভেতরে ভেতরে দমে গেল কিশোর। কিন্তু হাসিটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'ও, তাই নাকি? তোমার যে লেখার হাতও আছে তা তো জানতাম না। আমার অবশ্য ওসব ট্যালেন্ট একেবারেই নেই। তোমার জায়গায় আমি হলে এখন রাত-দিন মানতাম না। বেরিয়ে চলে যেতাম। শহরে গিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকতাম। কাবাব খেতাম। তারপর সিনেমা দেখতে যেতাম।'

'ওসব আমারও খারাপ লাগে না। কিন্তু একা একা যেতে ইচ্ছে করছে না এখন।' কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল ট্রিশ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। 'কিন্তু তুমি আমাকে বিদেয় করার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠলে কেন?'

রক্ত সরে গেল কিশোরের মুখ থেকে। জোর করে হেসে রসিকতার চেষ্টা করল, 'আ-আমি তো পাগলই!...আসলে, ভাবলাম, কাজটাকে যাতে তুমি চাকরি মনে না করো...ছুটির স্বাধীনতাটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারো...বিরক্ত হয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে গেলে এরিক আর বেকিকে দেখবে কে?'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ট্রিশ। 'এহ্‌হে, দিলে তো দেরি করিয়ে। এরিক নিশ্চয় অস্থির হয়ে গেছে...'

দুধের গ্লাসটা ধরতে গেল ট্রিশ।

তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে গ্লাসটা চেপে ধরল কিশোর। 'আমিই নিয়ে যাচ্ছি। যত যা-ই বলো, তোমার আজকে ছুটি। কোনমতেই কাজ করতে দেব না। বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে ঘরে বসে গল্পই লেখোগে।'

গ্লাসটা নেয়ার জন্যে চাপাচাপি করল না ট্রিশ। বলল, 'হ্যাঁ, তা-ই করিগে।'

'হ্যাঁ, যাও,' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে একেবারে দমে গেছে কিশোর। কোনমতেই বের করা গেল না ট্রিশকে। এত সহজে গ্লাসটা তাকে দিয়ে দেয়ার কারণটাও অনুমান করতে পারছে। বিষ দিয়ে নিজের এরিককে খুন করার দায়টা পড়বে কিশোরের ঘাড়ে। পাগল হয়ে গিয়ে ছেলেটাকে খুন করেছে কিশোর–ডাক্তার, পুলিশ সবাই একবাক্যে বলবে সে-কথা।

'গ্লাসটা নিয়ে যাও তুমি,' ট্রিশ বলল। 'আমি আসছি। আমার এঁটো

বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে রেখে আসি।'

গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কি করবে এখন? গ্লাসটা যদি এরিককে না দেয় নেমে চলে আসবে সে। দুধের জন্যে চেঁচানো শুরু করবে। আরেক গ্লাস বিষ মেশানো দুধ বানিয়ে দেবে ট্রিশ।

দুধটা না ফেলার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। ট্রিশ তার ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। দেখা যাক, দুধ না পেয়ে এরিক কি করে।

এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়েই গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। মুসাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'কি ব্যাপার, তোমার কোন খবরই নেই?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ভাবলাম কি জানি কি অঘটন ঘটে গেল। তাই দেখতে এলাম। বাড়িটা খুঁজে বের করে নিতে অসুবিধে হয়নি…'

হাত ধরে মুসাকে একটানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি এসে বাঁচালে আমাকে। তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।' গ্লাসটা দেখিয়ে বলল, 'আমি শিওর, এর মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে ট্রিশ। কায়দা করে ওর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। এরিককে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল…'

'বলো কি!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'দুধের মধ্যে বিষ! তারমানে তাড়ানো যায়নি এখনও ওকে। ছুরিটার কি খবর?'

'আস্তে বলো! কি যে ঘটেছে, বললে বিশ্বাস করবে না। এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড…'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা তার পাশ কাটানোর চেষ্টা করল মুসা। ধাক্কা লেগে কিশোরের হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেল।

'এহ্‌হে,' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'কি করলাম, দিলাম সর্বনাশ করে!'

রান্নাঘরের দরজার দিকে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিশোরও ঘুরে তাকাল। ট্রিশ বেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। 'অসুবিধে নেই। আমি এখুনি ন্যাকড়া নিয়ে এসে মুছে দিচ্ছি।'

'থ্যাংকস,' কিশোর বলল।

মুসার দিকে তাকিয়ে রইল ট্রিশ। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ। মুসা আমান। আজই রকি বীচ থেকে এসেছে।'

'হাই,' হাত বাড়িয়ে দিল ট্রিশ। 'আমি ট্রিশ।'

'হাই,' হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা।

ট্রিশ আবার রান্নাঘরে চলে গেলে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'বুদ্ধিটা ভালই করলে।…ছুরিটার কথা পরে বলব। জলদি আরেকটা বুদ্ধি বের করো। ট্রিশকে খানিকক্ষণের জন্যে আমার ঘাড় থেকে নামাও। ওর ঘর তল্লাশী করতে হবে আমার। বেড়াতে নিয়ে যাও, কিংবা যা খুশি করো। যত বেশি

সময় দিতে পারবে আমাকে…'

'কি করে নেব?'

'আজ ওর ছুটি। সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে দেখতে পারো।'

'যদি না যায়?'

'দেখই না চেষ্টা করে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ট্রিশ। হাসিমুখে এগিয়ে এসে ন্যাকড়া চেপে ধরল মাটিতে। দুধ শুষে নিল কাপড়। সেটা নিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে চিপে ফেলে দিয়ে এল ট্রিশ। দুধে ভেজা মেঝেটা মুছে দিতে লাগল। মোছা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাসল মুসার দিকে তাকিয়ে। কিশোরের দিকে ফিরল। 'যাই, এরিককে আরেক গ্লাস দুধ বানিয়ে দিয়ে আসি। মুশকিল হলো, চকলেট পাউডার শেষ। সব ঢেলে দিয়েছিলাম এ গ্লাসটাতে। দেখি, খালি দুধ খেতে যদি রাজি হয় সে।'

'চকলেট!' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর। তারমানে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি? ভাবল সে। চকলেট পাউডারকে ভাবছি বিষ?

মুসাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। মুসার চোখেও প্রশ্ন।

'থাক, তোমার যেতে হবে না,' ট্রিশকে বাধা দিল কিশোর। 'আমিই যাচ্ছি দুধ বানাতে। তুমি মুসার সঙ্গে কথা বলো।'

'এসেছিলাম কিশোরকে নিয়ে যেতে,' মুসার কথা কানে এল কিশোরের। 'সিনেমা দেখতাম। ও তো রাজি হলো না। নতুন জায়গা। একা একা যেতে ভালও লাগছে না আমার। তুমি যাবে? গাড়ি আছে আমার সঙ্গে।'

'তারচেয়ে বরং চলো গাড়িতে করেই ঘুরে আসি খানিক,' মুসা আর কিশোর দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল ট্রিশ। 'রাতের বেলা গাড়িতে চড়তে ভাল লাগে আমার।'

উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কিশোরের। রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল ট্রিশের কথা, 'তুমি এক মিনিট দাঁড়াও। আমি চট করে শার্টটা বদলে আসি।'

ট্রিশ ওপরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিভিং রুমে ফিরে এল কিশোর। মুসাকে বলল, 'দেখো, তোমার ওপর না আবার আসর করে বসে।'

'ভয় দেখিও না, প্লীজ! তাহলে কিন্তু যেতে পারব না বলে দিলাম!' মুসা বলল। 'কতক্ষণ বাইরে থাকব। ঘণ্টা দুয়েকে হবে?'

'হবে। কিন্তু সাবধান, মুসা। খুব সাবধানে থাকবে। আমার ভয় লাগছে।'

'তুমি যখন ভয় পাচ্ছ, সাংঘাতিক মেয়েই ও, বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সাবধানেই থাকব…'

'এই যে, মুসা,' সিঁড়ির ওপর থেকে বলল ট্রিশ, 'আমি চলে এসেছি।' কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'কিশোর, আমরা বাইরে যাচ্ছি। নিশ্চয় বলেছে

তোমাকে মুসা। গাড়িতে করে একটু পাহাড়ের ওদিক থেকে ঘুরে আসিগে।'

বাইরে ওদের গাড়ির শব্দটা গেটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল কিশোর। রান্নাঘরে ঢুকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে উঠে এল দোতলায়। এরিকদের ঘরে ঢুকে বলল, 'এই যে, নাও তোমার দুধ।...এরিক, ও ঘুমিয়ে পড়েছে...'

গ্লাসটা টেবিলে রেখে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল সে। কমিকের বইটা এরিকের বুকের ওপর পড়ে আছে। আস্তে করে হাত তুলে বইটা সরিয়ে রাখল কিশোর। বেকির মাথাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বালিশটা ঠিক করে দিল ওর মাথার নিচে। আলো নিভিয়ে, ডিম লাইটটা জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। টেনে ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

রান্নাঘরে ফিরে এল কিশোর। সেই নম্বরে ফোন করল আবার, যেটাতে সাড়া দিয়েছিল টবি নামের ছেলেটা। মিস্টার ব্রনসনের বাড়িতে কি ঘটছে জানা দরকার।

কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও আর লাইন পেল না কিশোর। বিজি হয়ে আছে ফোন। সময় দ্রুত কেটে যাচ্ছে। ফোনের পেছনে আর সময় নষ্ট না করে কাটিংগুলো খুঁজে বের করা দরকার।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আবার দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল কিশোর। ট্রিশের ঘরে ঢুকল। ছুরি থেকে বেরিয়ে পড়া রক্তের দাগ লেগে আছে এখনও কার্পেটে।

টান দিয়ে ড্রেসারের ড্রয়ার খুলল সে। রক্ত লাগা কাপড়গুলো সরিয়ে ফেলেছে ট্রিশ। এটা একটা স্বস্তি। কিন্তু ড্রয়ারের গায়ে রক্তের দাগ রয়েছে। ছুরি থেকে রক্ত বেরোনোর দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

আতিপাতি করে খুঁজেও ওপরের ড্রয়ারটায় একটা কাটিংও পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়টা খুলল। একের পর এক ড্রয়ার খুঁজে চলল সে। কোনটাতেই পেল না।

শুধু কাপড়-চোপড়।

কাগজের চিহ্নও নেই।

ড্রেসারের ড্রয়ার, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার, সব জায়গায় খুঁজল বিছানার তলায় খুঁজল। কোথাও নেই। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল চারপাশে। কোথায় রাখল? জুতোর শেলফটার দিকে তাকাল। দু'তিন জোড়া লেডিস জুতো আর স্যান্ডেলের নিচে একটা জুতোর বাক্স।

বাক্সটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গেল সেদিকে। বাক্সটা বের করে এনে ডালা খুলল। চামড়ার একজোড়া গোড়ালি-ঢাকা নতুন বুট। আশা করেছিল, বাক্সের মধ্যে দেখতে পাবে কাগজগুলো। কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

বুট দুটো আবার বাক্সে ভরে রাখতে গিয়ে কাত হয়ে গেল একটা বুট। খোলা মুখটা নিচের দিকে। ঝরঝর করে ভেতর থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটা কাগজ।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। এই তো পাওয়া গেছে।

জুতোটাকে ভালমত উপুড় করে ধরে ঝাঁকি দিতেই বাকি কাগজগুলোও পড়ল। আর আছে কিনা দেখার জন্যে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। আর নেই।

মাটিতে পড়ে থাকা কাটিংগুলো থেকে একটা কাটিং তুলে নিল সে। লেখাগুলো ট্রিশ কিংবা লীলা সংক্রান্ত নয়। ওল্টাল কাগজটা। স্থির হয়ে গেল।

বক্স করে ছাপা লেখাটার ওপরে একটা ছবি। তাতে তিনজন লোকের যৌথ ফটো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনজনেই হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে।

কিশোরের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ, মাঝখানের ছবিটা তার পরিচিত।

বেকি আর এরিকের বাবা মিস্টার হোমার।

সতেরো

কম্পিত হাতটাকে যতটা সম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করতে করতে কাটিংটা পড়ল কিশোর:

রকি বীচের সরকারি উকিল মিস্টার হোমার হেরিং বীচের জনৈক ভবঘুরে মিস্টার ডাভ মিলারের পক্ষ নিয়ে আদালতে লড়ছেন। আগুন লাগানোর অভিযোগ আনা হয়েছে মিস্টার মিলারের বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার সিক্সথ জুন স্ট্রীটের পার্কিং লটের কাছ থেকে তাকে দৌড়ে পালাতে দেখা গেছে। ওই সময় আগুন দেখা যায় অ্যান্ডারসন কোম্পানির অফিস থেকে। মিস্টার অ্যান্ডারসন একজন বিখ্যাত উকিল।

মিস্টার অ্যান্ডারসন!

ট্রিশ আর লীলার বাবা! ভাবছে কিশোর। পড়তে লাগল আবার:

মিস্টার ডাভ মিলার দাবি করেছে, ওই সময় সস্তা খাবারের দোকান থেকে বার্গার কিনে পার্কিং লটে বসে খাচ্ছিল সে। এ সময় আগুন দেখতে পায় মিস্টার অ্যান্ডারসনের অফিসের জানালায়।

কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেনি পুলিশ। রেল লাইনের পাশে একটা ভাঙা বাড়িতে থাকে মিস্টার মিলার তার বাড়িতে গ্যাসোলিনের খালি টিন পেয়েছে। তাতে খানিকটা পেট্রল তখনও ছিল। সে জানিয়েছে, অ্যান্ডারসনের কাছে একদিন টাকা ভিক্ষে চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস, অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আগুন লাগিয়ে অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে মিস্টার মিলার। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একজন ভবঘুরের পক্ষে লড়াই করেছেন মিস্টার হোমার, তাতে ট্রিশের কি?

আরেকটা কাটিং তুলে নিতে যাবে কিশোর, বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। জানালার কাছে দৌড়ে এসে উঁকি দিল নিচে।

মুসা আর ট্রিশ। এত তাড়াতাড়ি চলে এল!

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ততক্ষণে ট্রিশ।

কি করবে এখন? কি করা যায়? আতঙ্কে জমে গেল যেন কিশোর।

কাগজের টুকরোগুলো তুলে নিল মুঠো করে। জুতোর বাক্সটা খুলে পড়ে আছে। বুট দুটো মেঝেতে।

কি করবে?

বুট দুটো প্রথমে বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে। তারপর বাক্সটা রেখে দিতে হবে জায়গামত।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। পাগলের মত বুট দুটো বাক্সে ভরতে শুরু করল সে। তাড়াহুড়োয় ভেতরে রাখতে পারছে না ঠিকমত। যতখানি পারল, ঠেসে ভরে ডালাটা চেপে বসিয়ে দিল ওপরে। বাক্সটা তুলে রেখে দিল যেখান থেকে নামিয়েছিল।

নিচে সদর দরজা লাগানোর শব্দ হলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপরে উঠে আসছে ট্রিশ।

ওর অলক্ষে কোনমতেই এখন আর এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না সে। সামনের বারান্দা ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ নেই।

কাটিংগুলো হাতে নিয়ে খাটের নিচে ঢুকে গেল কিশোর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। শব্দ কমানোর জন্যে হাতে কামড় বসাল।

'আলোটা জ্বেলে রেখেই বেরিয়েছিলাম নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল ট্রিশ। ওর পায়ের নড়াচড়া দেখেই বোঝা গেল, সারা ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ কিশোর। একটা কাটিং পড়ে আছে কার্পেটের ওপর। দেখতে পায়নি সে। ঠিক ওটার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে চলে গেল ট্রিশের পা।

ঝুঁকে কাটিংটা তুলে নিল ট্রিশ।

জুতোর বাক্সটা টেনে নামাতে দেখল কিশোর। পরক্ষণে সোজা হয়ে গেল ট্রিশ। দরজার দিকে ছুটল।

'কিশোর! কিশোর?' বলে ডাকতে শুরু করল দরজার বাইরে গিয়ে।

ট্রিশের কণ্ঠস্বর শুনেই অনুমান করতে পারল কিশোর, কোথায় আছে ও পায়ের শব্দ বুঝিয়ে দিল কিশোরের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

এটাই সুযোগ, ভাবল কিশোর।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে চলে এল খাটের নিচ থেকে। লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল।

চাচা-চাচীকে দরকার এখন তার। কাটিংগুলো ওদেরকে দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে, ট্রিশের এখানে আসার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

এতটাই ভয় পেয়ে গেছে কিশোর, চিন্তা করতে পারছে না ঠিকমত।

এরিক আর বেকিকে একলা বাড়িতে ফেলে যাওয়া কি এখন ঠিক হবে?

ওরা ঘুমিয়ে আছে, নিজেকে বোঝাল কিশোর। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাচা আর চাচীকে নিয়ে ফিরে চলে আসবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।

বড় করে দম নিয়ে বারান্দা ধরে দৌড় মারল কিশোর।

দেখে ফেলল ট্রিশ। রাগে চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর! কি করছ···অ্যাই!'

কিন্তু ফিরল না কিশোর। সোজা ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে চলে এল বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বাইরে।

সামনের লনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসাকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'মুসা, তুমি আছ! বাঁচলাম!'

'শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই মত বদলে ফেলল ট্রিশ,' মুসা জানাল। 'যেতে চাইল না আর। বলল, বাড়ি ফিরে যাবে···'

'মুসা, কথা পরে হবে!' কিশোর বলল। 'জলদি স্টার্ট দাও। চাচা-চাচীর কাছে যেতে হবে আমাকে। এক্ষুণি।'

আধ সেকেন্ড দ্বিধা করল মুসা। দৌড় মারল গাড়ির দিকে। কিশোর আর সে প্রায় একই সঙ্গে দু'দিক থেকে গাড়িতে উঠে বসল।

ইঞ্জিন চালু হলো। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে নাক ঘোরাল গাড়ি। গেটের দিকে ছুটল।

'আমি···আমি কাটিংগুলো নিয়ে এসেছি!' কিশোর বলল। 'চাচা-চাচীকে দেখাতে হবে এগুলো। আমি···' মুসাকে দেখাতে গিয়ে একটা কাটিঙের লেখায় চোখ পড়তে থেমে গেল সে। জোরে জোরে পড়তে শুরু করল:

'···ভবঘুরে মিস্টার মিলার আজ ছাড়া পেয়েছে। তার আগুন লাগানোর অভিযোগটা মিথ্যে প্রমাণ করেছেন মিস্টার মিলার। বরং অভিযোগটা জোরাল করে তুলেছেন মিস্টার অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধেই। তিনি অভিযোগ এনেছেন, মিস্টার অ্যান্ডারসন কোন কারণে নিজের অফিস নিজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন···'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'এতক্ষণে বুঝলাম!' উত্তেজিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

'কি?' সামনের রাস্তার দিকে মুসার চোখ। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা। সামনে তীক্ষ্ণ মোড়। অসতর্ক হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

'বুঝতে পারছ না?' কিশোর বলল। 'নিজের অফিসে নিজে আগুন লাগানোর জন্যে মিস্টার অ্যান্ডারসনকে দায়ী করেছেন মিস্টার হোমার।'

'তারমানে বলতে চাইছ, বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কারণে মিস্টার হোমারের প্রতি আক্রোশ জন্মেছে ট্রিশের? এরিক আর বেকিকে খুন করে তার শোধ নিতে চাইছে?'

'হ্যাঁ। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, এই ক্ষমতা পেল কোথায় ট্রিশ? ভূতে আসর করেনি তো?'

'আল্লাহ্ই জানে।'

ড্যাশবোর্ডের আলোয় কাটিঙের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে থাকল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল আচমকা, 'অ্যাই শোনো, লীলা বলে কোন বোন নেই ট্রিশের। এখানেও সে মিছে কথা বলেছে। ট্রিশই লীলা। লীলাই ট্রিশ!'

আঠারো

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলল মুসা। 'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, এই ছবিটা দেখো!'

ছাতের আলোটা জ্বেলে দিল মুসা। ভাল করে দেখার জন্যে। কাত হয়ে এল কিশোরের দিকে। ছবিটার দিকে তাকাল। 'কি করে বুঝলে ট্রিশই লীলা?'

'ছবির পোশাকটা দেখছ? লাল শার্ট, সাদা প্যান্ট। অবিকল এই পোশাকে দেখেছি আমি ট্রিশকে।'

'তাতে কি? যমজ বোনেরা এক রকমের পোশাক পরেই থাকে।'

'উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'হাসপাতালে ফোন করে জানা দরকার, লীলা সত্যি কোমার মধ্যে আছে কিনা।...থামলে কেন? চালাও। চাচা-চাচীর সঙ্গে দেখা করা দরকার যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

আবার গ্যাস পেডালে চাপ দিল মুসা। গতি না কমিয়ে পেরিয়ে এল মোড়টা।

সাগর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে ঘন কুয়াশা। সামনের রাস্তার ওপর জমে থেকে দৃষ্টি অচল করে দিচ্ছে।

কোন দিকে নজর নেই কিশোরের। একের পর এক কাটিং পড়ে চলেছে সে। মনে মনে দোয়া করছে বেকি আর এরিকের জন্যে—আল্লাহ্ ওদের ভাল রেখো!

কুয়াশার কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সামনে কয়েক গজের বেশি চোখে পড়ে না। হঠাৎ আবার থামিয়ে ফেলল মুসা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না মুসা। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মুসা, কি হলো তোমার? কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

ফণা তোলা সাপের মত ধীরে ধীরে এ পাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল মুসা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ঘোলা দৃষ্টি। ঘোরের মধ্যে চলে গেছে যেন সে।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিতে লাগল। 'এমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?'

চোখে পলক পড়ছে না মুসার। কিশোরের কথার জবাব দিল না। দুলেই চলেছে।

'মুসা, দোহাই তোমার!···থামো! থামো!···প্লীজ!'

দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল মুসার।

সামনের দিকে ঢলে পড়ল মাথাটা। কপাল ঠুকে গেল স্টিয়ারিঙে।

'মুসা!' মাথাটা চেপে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল কিশোর।

নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে মুসার। কান দিয়েও বেরোনো শুরু করল।

মুসার মাথাটা তুলে সীটের হেলানে রাখল কিশোর। হেলে পড়ল মাথাটা। শূন্য চোখ দুটো যেন কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে।

রবিন! নিশ্চয় রবিনেরও এই অবস্থাই হয়েছে। ভাবল কিশোর।

কি করব এখন? কি করা যায়? রক্তক্ষরণ হয়ে এ ভাবে মরতে দেয়া যায় না ওকে।

মাথা ঠাণ্ডা করো! শান্ত হও! নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর।

সাহায্য দরকার এখন।

নিজের পাশের দরজাটা খুলতে গেল সে।

খুলল না।

লক আটকানো?

না

মুসার নিথর দেহটার ওপর দিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে অন্য পাশের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল।

ওটাও খুলল না।

বহু চেষ্টা করেও দুটো দরজার একটাও খুলতে পারল না কিশোর।

বেরোতে হবে! যে করেই হোক! বার বার নিজেকে বলতে লাগল সে। ছন্দের মত মুখ থেকে বেরোতে থাকল কথাগুলো।

জানালার কাঁচ ভেঙে বেরোতে হবে। কাঁপা হাতে টান দিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলল। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পাওয়া গেল।

সেটার হাতল দিয়ে অনবরত বাড়ি মারতে লাগল কাঁচের গায়ে।

ভাঙতে না পেরে হতাশার চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। চেঁচিয়ে বলল নিজেকে, 'থেমো না, কিশোর! চালিয়ে যাও! চালিয়ে যাও!'

অবশেষে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিল কাঁচের গায়ে।

নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর। বাড়তে শুরু করল ফাটল।

জানালার বাইরে চোখ পড়তে হঠাৎ থেমে গেল সে। আবছা অন্ধকারে ফুটে উঠেছে একটা মুখ।

ট্রিশ!

উনিশ

'ট্রিশ! তুমি?' আপনাআপনি শব্দ দুটো বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখ থেকে।

আচমকা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দরজাগুলো। যেন দমকা বাতাসের ঝাপটায়।

আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। পড়ে গেল মুসার গায়ের ওপর। ঝাঁকি লেগে মুসার মাথাটা আবার গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিঙে।

নিজেকে মুসার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। কুয়াশার কুণ্ডলী ঘুরতে শুরু করল বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ট্রিশ। ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে দৃশ্য। খসখসে কণ্ঠে অট্টহাসি হেসে উঠল সে। 'বেরিয়ে এসো, কিশোর। পালাতে তুমি পারবে না।'

মাথা নিচু করে সীটের মধ্যে নিজেকে কুঁকড়ে গুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। লুকানোর জায়গা নেই। পালানোর পথ নেই।

ট্রিশের ঝিলমিল করতে থাকা কাঁপা কাঁপা ভুতুড়ে মুখটা এগিয়ে এল আরও কাছে। 'এসো, কিশোর। বেরোও।'

সরে যেতে চাইল কিশোর। কিন্তু কোথায় সরবে?

হারিকেনের মত জোরাল বাতাস বইতে শুরু করল। প্রবল শক্তিতে টানতে লাগল কিশোরকে।

সীট খামচে ধরে গাড়িতে থাকার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। ব্যথা হয়ে গেল আঙুল।

থাকতে পারল না কিশোর। বাতাসের সঙ্গে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চাইল।

প্রবল বাতাস অদৃশ্য একটা হাতের মত আবার চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলল তাকে। ঝরা পাতার মত পিছলে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে।

সেই অদৃশ্য হাতটা আটকে ফেলল তাকে এক সময়। খাড়া করে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

মুখোমুখি হলো ট্রিশ। দাঁত বের করে হাসছে।

'কেন করছ এ সব?' হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল

কিশোর। 'এই ক্ষমতা তুমি পেলে কোথায়?'

কুয়াশার কুণ্ডলী ঘিরে ফেলতে শুরু করল কিশোরকে। কুয়াশার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রিশকে মনে হলো মেঘের মধ্যে ভাসছে। কিশোরের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ তার পুরো মগজটার ব্যবহার জানে না। যদি কেউ জেনে যায়, অসীম ক্ষমতা জন্মায় তার। আমি জেনে গিয়েছি। তাই যা ইচ্ছে করতে পারি আমি। যা খুশি।'

যেন সেটা প্রমাণ করার জন্যেই খাড়া ভাবে শূন্যে উঠতে শুরু করল ট্রিশ। ফুটখানেক উঠে সরতে শুরু করল। গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটার বনেটের ওপর।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। চমকের ধাক্কাটা কাটাতে সময় লাগল। তারপর বলল, 'কিন্তু আমাদের ক্ষতি করতে চাইছ কেন তুমি?'

'কেন?' তিক্ত হাসি হাসল ট্রিশ। 'আমার জায়গায় তুমি হলেও এইই করতে। আমার বাবা কেন আত্মহত্যা করেছে জানো? তোমার আঙ্কেল মিস্টার হোমারের কারণে।'

'কিন্তু তোমার বাবা আত্মহত্যা করলেন কোথায়? তিনি তো নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন তুমি বললে।'

'অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার লোক ছিল না আমার বাবা,' রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ট্রিশ। 'আমার বাবা ছিল একজন মহৎ ব্যক্তি। একজন জিনিয়াস। কিন্তু তোমার আঙ্কেল হোমার তার পেছনে লেগে তার সর্বনাশ করে দিয়েছিল। তাকে অ্যারেস্ট করিয়েছিল। তার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিল আমাদের সবার জীবন। আমার মা আর লীলার জীবন। সে-জন্যে আমাদের বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিল আমার বাবা। আমাদের সবাইকে শেষ করে দিয়ে ভোগান্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু আঙ্কেল হোমার কেবল তার কর্তব্য পালন করেছেন,' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল কিশোর। 'ভবঘুরে ওই মানুষটা যদি নিরপরাধ হয়ে থাকে...'

'হয় হোকগে, তাতে আমার কি?' চেঁচিয়ে উঠল ট্রিশ। 'ওরকম একটা ভিক্ষুকের চেয়ে আমার বাবার জীবনের দাম অনেক বেশি। দু'জনের তুলনা করাটাই একটা গাধামি। তোমার আঙ্কেলের মত অতি সাধারণ লোক আমার বাবার মত ব্রিলিয়্যান্টদের ব্যাপারে জেলাস হতেই পারে। আমার বাবার মত মহৎ মানুষদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তৈরিই হয়ে থাকে তারা।'

ট্রিশের মত এক তরফা ভাবনা যারা ভাবে, তাদের সঙ্গে তর্কে গিয়ে লাভ নেই, বুঝতে পারল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'রেফারেন্স হিসেবে যে দুটো পরিবারের ফোন নম্বর দিয়েছ, তাদেরকে কি করেছ তুমি?'

'কে? ওই জজ আর তার অ্যাসিসট্যান্টের কথা বলছ? যা ওদের পাওয়া উচিত তা-ই পেয়েছে,' নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে জবাব দিল ট্রিশ। 'এবার হোমারের পরিবারের পালা। প্রথমে ওর ছেলেমেয়ে দুটো যাবে। তোমার কিংবা তোমার চাচা-চাচীর ওপর আমার কোন আক্রোশ ছিল না। কিন্তু

এত বেশি খুঁতখুঁতি শুরু করলে তুমি, নাক গলানো আরম্ভ করলে, তোমাকে শেষ না করে এখন আর কোন উপায় নেই আমার। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ।'

গাড়ির বনেট থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল ট্রিশ। এগিয়ে আসতে শুরু করল কিশোরের দিকে।

পালানোর তাগিদ অনুভব করল কিশোর। ট্রিশের সঙ্গে পারবে না বুঝে গেছে।

ঘুরে দৌড় মারতে গেল।

কিন্তু আটকে গেল পা। দশ মণ ভারী লাগছে একেকটা। মাটি থেকে তুলতেই পারছে না। ট্রিশকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা করল কিশোর, 'দেখো···তোমার এই সাংঘাতিক ক্ষমতা আমাদের পেছনে খরচ না করে অন্য কাজে লাগালে কোটিপতি হয়ে যেতে পারো তুমি। তুমি জানো, বেঁচে থাকতে টাকা দরকার।'

জবাব দিল না ট্রিশ। ডান হাতটা কিশোরের দিকে তাক করে ধরল বন্দুকের মত। প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস বইতে শুরু করল কিশোরকে ঘিরে।

মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল কিশোরের পা দুটো।

তার দেহটা নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল বাতাস।

'থামো! থামো! দোহাই তোমার!' হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল কিশোর।

জোরাল বাতাস গাড়িটার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল তাকে।

বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর। দুই হাতে মাথা চেপে ধরল, গাড়ির গায়ে আছড়ে পড়ে চূর্ণ হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে।

খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঠেলে দেয়া হলো ওকে।

ছুঁড়ে ফেলা হলো প্যাসেঞ্জার সীটে। মুসার নিথর দেহটার পাশে।

দড়াম করে বন্ধ হলো আবার দরজা।

কট্ করে তালা লেগে যাওয়ার শব্দ হলো।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশ। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

দরজা খোলার চেষ্টা করতে গেল কিশোর।

অদৃশ্য শক্তি সীটের সঙ্গে ঠেসে ধরে রাখল তাকে। নড়তেও দিল না।

আতঙ্কিত হয়ে দেখল রিলিজ হয়ে গেল ইমার্জেন্সি ব্রেক। আপনাআপনি চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'হেরে গেলে তুমি, কিশোর,' উল্লসিত সুরে বলে উঠল ট্রিশ।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

নাক ঘুরে গেল রাস্তার পাশের খাদের দিকে।

বিশ

পড়ে যাচ্ছে গাড়ি। চারপাশে অন্ধকার।

নিজের দেহটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল কিশোর। মাথা ঢেকে ফেলল দুই হাতে।

বহু নিচে আছড়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি লাগল। ছাতে গিয়ে বাড়ি খেল কিশোরের মাথা। চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

মুসার দেহটা বাড়ি খেয়ে এসে একপাশে কাত হয়ে গেছে। কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল প্যাসেঞ্জার ডোরের ওপর। এত জোরে, হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল তার মুখ থেকে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

গাড়ির সামনের দিকটা নিচু হয়ে যেতে শুরু করেছে। বেশ কিছুটা ঝুঁকে থেমে গেল।

হাঁসফাঁস করে ব্যথা হয়ে যাওয়া ফুসফুসে দম টানতে টানতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল কিশোর।

বেঁচে আছি আমি, ঘোরের মধ্যে কথাটা মনে হলো তার।

বেঁচে আছি, যে কোন ভাবেই হোক।

কিন্তু কি ভাবে?

প্যাসেঞ্জার ডোর খোলার চেষ্টা করল সে। পারল না। লেগে গেছে শক্ত হয়ে।

মুসার দিকে তাকাল সে। চোখ ভরে এল পানিতে। বেচারা মুসা! কিছু একটা করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মুসার দেহের ওপর দিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল ওটা। তারমানে গাড়িটাকে ফেলে দিয়ে এটার ওপর থেকে প্রভাব তুলে নিয়েছে ট্রিশ। ধরে নিয়েছে মুসা আর কিশোর দুজনেই মারা গেছে।

নিচে তাকাল কিশোর। অনেক নিচে অস্পষ্ট ভাবে পানি চোখে পড়ছে। অবাক হলো সে। মাঝপথে আটকে গেছে গাড়িটা। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। এখনও বিপদমুক্ত নয় সে।

কিসের মধ্যে গাড়ি আটকেছে দেখার চেষ্টা করল। পাহাড়ের গা থেকে চাতালের মত বেরিয়ে থাকা বড় বড় পাথরের খাঁজে আটকে গেছে গাড়িটা।

কতক্ষণ থাকবে?

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন নড়ে উঠল গাড়িটা। আরও কয়েক ইঞ্চি

সামনে ঝুঁকে আবার থেমে গেল। তারমানে যে কোন মুহূর্তে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওটার।

মুসার বুকে কান পাতল। হার্টবীট আছে কি নেই। বাঁচবে তো?

আবার নড়ে উঠল গাড়ি। গাড়ির সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল কিশোরের দেহ।

বেরোনো দরকার। দ্বিতীয়বার পড়লে আর বাঁচবে না। এত নিচে পড়বে গাড়ি, দুমড়ে মুচড়ে অবশিষ্ট বলতে আর কিছু থাকবে না। সেই সঙ্গে ভর্তা হয়ে যাবে সে আর মুসা।

আরেকটু নড়ে আবার থেমে গেল গাড়ি। খোলা দরজাটা দিয়ে, মুসার দেহের ওপর দিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে টেনে বের করল সে। অল্প একটুখানি জায়গা। সরে গেল গাড়ির কাছ থেকে। টেনে হিঁচড়ে মুসাকে বের করল গাড়ি থেকে।

আবার নড়ে উঠল গাড়ি। এবার আর থামল না। ক্রমশ নাক নিচু করতে করতে, শেষে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে নেমে চলল। নিচের পাথরে গিয়ে আছড়ে পড়ার বিশ্রী শব্দ কানে এল। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল সাগরের পানিতে।

শিউরে উঠল কিশোর। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। তবে বিপদ এখনও কাটেনি, বুঝতে পারছে। ওপর দিকে তাকাল। ট্রিশ কি আছে এখনও? ওকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে?

কি জানি, হয়তো দেখেছে। তবে কিশোর দেখতে পেল না ওকে। চাতালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল। কিনারের কাছে এসে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের দিকে।

অনেক নিচে পানি।

মুসা এখনও বেহুঁশ হয়ে আছে। তাকে নিয়ে নামা সম্ভব না। টেনেটুনে তাকে যতটা সম্ভব চাতালের গোড়ার দিকে এনে আরাম করে শুইয়ে দিল।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেঁয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। খাড়া ঢাল। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। নামা খুব কঠিন। কখনও মাটিতে নখ বসিয়ে দিয়ে, কখনও ছোট ছোট ঝোপ বা গাছ আঁকড়ে ধরে খুব ধীরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে চলল নিচে।

তার বিপদ আর অসুবিধে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই যেন ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। কুয়াশা তো আছেই। সেই সঙ্গে বইতে শুরু করল ঝোড়ো বাতাস।

বেশ কিছুটা নামার পর হঠাৎ করে হাতের আঙুলগুলো পিছলে গেল তার। থাবা দিয়ে একটা ছোট গাছ আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করল মাটি থেকে উপড়ে চলে এল গাছটা।

ধরে ঝুলে থাকার আর কোন অবলম্বন পেল না কিশোর। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল সে। নিচে পড়ল। প্রচণ্ড জোরে পাথরে ঠুকে গেল মাথা। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল চোখের সামনে।

একুশ

চোখ মেলল কিশোর। আকাশ চোখে পড়ল। বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। চোখ বন্ধ করে আবার মেলল। আবার চোখে পড়ল আকাশ। মেঘে ঢাকা। ভোর হয়েছে। কিন্তু মেঘের জন্যে আলো ছড়াতে পারছে না। অন্ধকার হয়ে আছে এখনও।

কনুইয়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঁচু করল নিজেকে। সাগরের গর্জন কানে আসতে মনে পড়ল কোথায় রয়েছে। কি ভাবে এসেছে এখানে, তা-ও মনে পড়ল।

ঠাণ্ডা, ভেজা পাথরে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে শীত লাগছে। চুল, মুখ, সারা গা ভেজা। মাটি আর কাদায় মাখামাখি। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল এক গুচ্ছ ভেজা চুল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চার পাশে তাকাল। একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর পড়ে আছে। আরেকটু সরে পড়লেই সাগরের পানিতে গিয়ে পড়ত।

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে যে কোন মুহূর্তে নামবে আবার। ভাঙা গাড়িটা কোথাও দেখতে পেল না। পানিতে তলিয়ে গেছে।

মুসা কি বেঁচে আছে? ওপরের চাতালের দিকে তাকাল। মুসার নাম ধরে বার বার ডাকতে লাগল। অনেক ওপরে। শব্দ বোধহয় পৌঁছায় না ওখানে। জবাব এল না মুসার কাছ থেকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। যেখান দিয়ে নেমেছে সেখান দিয়ে ওঠার আর সাধ্য নেই ওর। পাথরটা থেকে নেমে এসে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল সরু সৈকত ধরে। মানুষজনের দেখা পেলে সাহায্য চাইবে। বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে ওকে।

বাড়ির কথা ভাবতেই ট্রিশের ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা চেহারাটা মনে পড়ল। ওকে ঠেকানো দরকার। নইলে চাচা-চাচী, এরিক, বেকি কাউকে রেহাই দেবে না। চাচা-চাচী কি ফিরেছে? বলে গেছে রাতে না-ও ফিরতে পারে। এরিক আর বেকির জন্যে শঙ্কাটা আরও বেড়ে গেল ওর।

এক ঘণ্টা ধরে একটানা হেঁটেও কারও দেখা পেল না কিশোর। তারমানে এদিকে খুব একটা আসে না কেউ। একটা জিনিস লক্ষ করল, নিচু হয়ে আসছে পাহাড়ী খাদের পাড়। যেটার ওপর রাস্তাটা রয়েছে।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর পরিচিত লাগল ঢালটা। ভাল করে তাকাতে চিনতে পারল। এখান থেকে ওদের বাড়িটা বেশি দূরে না।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে বুঝে শক্তি বেড়ে গেল তার। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। আরও কয়েক মিনিট হাঁটার পর সাগরকে পেছনে রেখে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। বন-জঙ্গলে ভরা। পায়ে চলা পথ চলে গেছে।

সেটা ধরে এগিয়ে এসে পৌঁছল মিস্টার ডেভিলের কবরটার কাছে। ফুলগুলো আছে এখনও। তবে মরে গেছে। বৃষ্টির পানি লেগে, আছে পাপড়িগুলোতে।

কবরটা দেখে রাগ মাথা চাড়া দিল কিশোরের মগজে। কতগুলো খুন করেছে ট্রিশ! এখনও ওকে ঠেকাতে না পারলে আরও অনেককে মরতে হবে।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে কটেজের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কাউকে চোখে পড়ল না। মনে হচ্ছে বাড়িতে লোক আছে।

বড় বেশি নীরব।

গেল কোথায় সবাই?

সামনে দিয়ে ঢোকার সাহস পেল না সে। ঘুরে চলে এল কটেজের পেছনে। নিঃশব্দে উঠে এল বারান্দায়। দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।

লিভিং রূমে কাউকে দেখতে পেল না।

দরজার নব ধরে মোচড় দিল। খোলা। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল পাল্লা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ট্রিশের কণ্ঠ।

চট করে দরজার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।

'এখনও তো আসেনি, আন্টি,' টেলিফোনে কথা বলছে ট্রিশ। 'ঠিক আছে, কিশোর এলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতে বলব আপনাদের।...না না, বেকি আর এরিককে নিয়ে এক বিন্দু চিন্তা করবেন না। রাখি? বাই।'

পর্দার নিচে দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ট্রিশ। কাঁধে তোয়ালে। নিশ্চয় গোসল করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোন আসাতে বাথরূমে না ঢুকে ফোন ধরেছে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গিয়ে লিভিং রূমের বাথরূমটায় ঢুকে পড়ল সে। কিশোর, কিংবা চাচা-চাচী কেউ না থাকায় পুরো বাড়িটাই এখন ওর হয়ে গেছে। যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

শাওয়ারের শব্দ কানে এল কিশোরের। কয়েক মিনিটের জন্যে নিশ্চিন্ত গোসল করতে যখন ঢুকেছে ট্রিশ, বেরোবে না এত তাড়াতাড়ি

এরিক আর বেকি কোথায়? অজানা আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠল কিশোরের বুক। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল ওপরের বারান্দায়।

এরিকদের ঘরের দরজা বন্ধ। তাড়াতাড়ি এসে দরজায় ঠেলা দিল কিশোর। খুলে গেল দরজা। বিছানায় দেখতে পেল দু'জনকে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। কাছে এসে দুজনের নাকের কাছে হাত দিয়ে যখন বুঝতে পারল নিঃশ্বাস পড়ছে, হাঁপ ছাড়ল

মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। গুড়গুড় শব্দ হলো খিদেটা টের পেল এতক্ষণে।

আবার নেমে এল নিচে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। ট্রিশ বেরোয়নি। রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর।

ফ্রিজ খুলে কমলার রসের বোতল, পাঁউরুটি আর জেলির বয়াম বের করল সে। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

পেটে খাবার পড়তে শান্ত হয়ে এল মগজটা। গুছিয়ে ভাবতে পারল আবার। ট্রিশ বাথরুমে। কোনমতে ওকে আটকে ফেলতে পারলে এরিক আর বেকিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সোজা চলে যাবে থানায়। পুলিশকে নিয়ে চলে যাবে গাড়িটা যেখানে ফেলে দিয়েছে ট্রিশ, সে-জায়গাটাতে।

ট্রিশ এখনও বাথরুমে। রুটি চিবাতে চিবাতে লিভিং রুমে ফিরে এল কিশোর। আস্তে করে লাগিয়ে দিল বাথরুমের বাইরের দিকের ছিটকানিটা। তারপর দৌড় দিল আবার দোতলায়। এরিকদের ঘরে ঢুকল।

এক ঝাঁক দিতেই জেগে গেল এরিক। কিন্তু বেকিকে নিয়ে হলো সমস্যা। ঘুম ভাঙল বটে। কিন্তু তুলে বসানো সহজ হলো না।

'জলদি এসো আমার সঙ্গে!' বেকির হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে খাট থেকে নামাল কিশোর। এরিকের দিকে ফিরল। 'বসে আছ কেন? এসো না!'

বিমূঢ়ের মত খাট থেকে নামল এরিক। কিশোর ভাই আবার পাগল হয়ে গেছে কিনা ভাবছে হয়তো।

দুজনের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে এল কিশোর। গোসল শেষ হয়ে গেছে ট্রিশের। বাথরুমের দরজায় থাবা মারছে আর চিৎকার করে ডাকছে, 'এরিক? বেকি? দরজাটা আটকেছে কে? জলদি খোলো।'

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।

ট্রিশের চিৎকার শোনা গেল, 'কিশোর, তুমি ফিরে এসেছ, তাই না? হুঁ, তারমানে তুমি মরোনি···ঠিক আছে, আমি আসছি। আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

মড়মড় করে উঠল বাথরুমের দরজা। কব্জার কাছে ভেঙে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, তার ভয়ানক ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছে ট্রিশ। পালাতে আর পারবে না বুঝে গিয়ে মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর। ভারী একটা পিতলের ফুলদানী তুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল বাথরুমের দরজার এক পাশে।

প্রচণ্ড শক্তির চাপে ভেঙে পড়ল দরজার পাল্লা। সেটা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ট্রিশ তার মাথাটা দরজার এ পাশে আসতেই ধাঁ করে চাঁদিতে বসিয়ে দিল কিশোর

এ রকম কিছু আশা করেনি ট্রিশ। তৈরি ছিল না। টলে উঠল সে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

বাইশ

স্টোর রুম থেকে দড়ি জোগাড় করে এনে ট্রিশের হাত-পা বেঁধে ফেলল কিশোর।

বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে এরিক। কাঁদতে শুরু করেছে বেকি। কিশোর ভাই যে পুরো পাগল হয়ে গেছে, বেকিরও যেন সেটা বুঝতে বাকি নেই আর। কল্পনাই করতে পারল না, কি কারণে ট্রিশ আপুকে মেরে বেহুঁশ করে তার হাত-পা বাঁধছে কিশোর।

বাঁধা শেষ করে ভাই-বোনের দিকে তাকাল সে। চিৎকার করে উঠল, 'জলদি বেরিয়ে যাও! গ্যারেজের মধ্যে, বনের ভিতর, যেখানে পারো গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। খবরদার, আমি না ডাকলে আর ঘরে আসবে না। যাও!'

ভয় পেয়ে গেছে এরিক আর বেকি। অমান্য করার সাহস পেল না। বেকিকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল এরিক।

রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। ফোনের রিসিভার তুলে নিল। দ্রুত হাতে বোতাম টিপল। 'হালো···হালো···অপারেটর?···আমাকে থানার নম্বরটা দিতে পারেন, প্লীজ!'

অপারেটরকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার বোতাম টিপতে শুরু করল কিশোর। 'হালো? পুলিশ? একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কাল রাতে।···আমি হিল কটেজ থেকে বলছি···এখান থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তায় যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সেখানে পাড় খুব উঁচু। ঢালের গায়ে চাতালের মত পাথর বেরিয়ে আছে। সেখানে একজন মানুষ পড়ে আছে। নিচের সাগরে পড়ে আছে গাড়িটা···'

লিভিং রুমে ট্রিশের গলা শুনে থেমে গেল কিশোর। সে আচমকা থেমে যাওয়ায় ওপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল, 'হালো হালো, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?'

কিন্তু জবাব দেয়ার অবস্থা নেই কিশোরের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ট্রিশের দিকে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড করছে ট্রিশ। হাত-পাগুলো টানটান করে দিয়েছে। মটমট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে শক্ত দড়ির বাঁধন।

এখানে থাকলে বাঁচতে পারবে না। ট্রিশ উঠে দাঁড়ানোর আগেই পালাতে হবে। রিসিভার ফেলে বেরোনোর দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর একটানে দরজা খুলে লাফ দিয়ে পড়ল বাইরে। চারপাশে তাকিয়ে কাছাকাছি লুকানোর কোন জায়গা না দেখে দৌড় দিল গ্যারেজটার দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে কোনখানে দেখতে পেল না এরিক কিংবা বেকিকে গাড়ি না থাকায় গ্যারেজের দরজা খোলা। একপাশে শোফারের ঘর।

হুড়মুড় করে এসে ঢুকল শোফারের ঘরে। ভেতর থেকে দরজার ছিটকানি আটকে দিল।

ভাবতে লাগল কিশোর। আচমকা কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ নিশ্চয় অবাক হবে। খোঁজ করতে আসবে হিল কটেজ, অর্থাৎ ওদের বাড়িটাতে। ওদের সামনে ট্রিশ আর কিছু করতে সাহস পাবে না।

দুরুদুরু বুকে পুলিশ আসার অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

তেইশ

আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা।

কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল গ্যারেজের সামনের দিকের দরজা।

ভীষণ চমকে গেল কিশোর।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ট্রিশকে। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে সে। হাসি হাসি মুখ। কিশোরকে দেখে বলল, 'তোমাকে বলেছি না আমি, পালাতে পারবে না। বেহুঁশ করে দিয়ে আমার উপকারই করেছ বরং। মনটা পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লে শক্তি সঞ্চয় হয় আমার। ব্যাটারি রিচার্জের মত। অনবরত অ্যাকশনে গিয়ে কিছুটা কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। আবার পুরোপুরি তাজা হয়ে গেছে আমার মগজের শক্তি। তোমাকে মরতে হবে এখন, কিশোর...'

'প্লীজ, ট্রিশ! আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি...'

'মরতে তোমাকে হবেই,' কিশোরের কথা যেন কানেই ঢোকেনি ট্রিশের। 'নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, কাল তোমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে এসেও কেন বেঁচে আর এরিককে মারিনি? ওরাও দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এটা দেখাতে চাই আমি। সে-জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করব। তবে সবার আগে তোমাকে খতম করা দরকার। কারণ তুমি এখন শুধু আমার শত্রু নও, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছ। আর কাউকে মারতে এত ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমার। তোমার ব্যাপারে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।...যাকগে, যা হবার হয়েছে। পালাতে তো আর পারছ না। শেষ পর্যন্ত মরতেই হচ্ছে তোমাকে...'

ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল ট্রিশ।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসতে লাগল কিশোরের।

আরেক পা আগে বাড়ল ট্রিশ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। চোখ জ্বলছে।

পালাতে হবে আমাকে, ভাবছে কিশোর। সরে যেতে হবে দানবটার কাছ

থেকে।

'উঁহু, তুমি নড়বে না,' যেন তার মনের কথা পড়তে পেরে বলে উঠল ট্রিশ। সম্মোহন করার মত মোলায়েম কণ্ঠস্বর। আচমকা চোখ ফেরাল ছোট টেবিলে রাখা একটা ধুলো পড়া কাঁচের ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে।

লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল সেটা। ছুটে এল কিশোরকে লক্ষ্য করে। চিৎকার করে উঠল কিশোর। ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল। দৌড় মারল দরজার দিকে। দেয়ালে বাড়ি লেগে ঝনঝন করে ভাঙল ভাসটা।

চোখের পলকে সামনে চলে এসে কিশোরের পথরোধ করল ট্রিশ। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল টেবিলের একপাশে রাখা একটা পুরানো চেয়ার। তারপর দল বেঁধে উড়তে শুরু করল যেন টেবিলে রাখা জিনিসপত্র—অ্যাশট্রে, মোমবাতি, পুরানো ম্যাগাজিন। সাইক্লোনে পড়ে ঘুরতে শুরু করল যেন সেগুলো।

দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ফ্রেম খুলে এসে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙল। কাঁচ আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে গেল মেঝেতে।

কিশোরের মনে হলো পুরো ঘরটাই বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে। দুই হাতে মাথা ঢাকল সে। ভাবছে, আটকা পড়েছি আমি ভালমত! আর বেরোতে পারব না!

উড়তে থাকা জিনিসপত্রগুলোর ঘোরার গতি বেড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জানালার কাছে সরে যেতে লাগল কিশোর।

'পালাতে তুমি পারবে না, কিশোর, যত চেষ্টাই করো!' কানে এল ট্রিশের কঠিন কণ্ঠ।

দপ করে জ্বলে উঠল জানালার পুরানো পর্দাটা। আগুন ধরে গেল একপাশে ফেলে রাখা কাঠের বাংকটাতে। চেয়ার, টেবিল, সব কিছুতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল দ্রুত। আগুন লেগে গেল কাঠের বেড়ায়।

'ট্রিশ, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'এখানে থাকলে আমার সঙ্গে তুমিও পুড়ে মরবে!'

'মরবে শুধু তুমি,' যান্ত্রিক কণ্ঠে জবাব দিল ট্রিশ।

ধোঁয়া বাড়তে লাগল। তার মধ্যে দিয়ে কাঁপা কাঁপা ভাবে ট্রিশকে দেখতে পেল কিশোর।

ক্রমেই ঘন হচ্ছে ধোঁয়া। আগুনের তেজ বাড়ছে। সহ্য করতে পারছে না কিশোর। চামড়া পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। আরেকটু বাড়লে কাবাব হয়ে যেতে হবে। কাশতে শুরু করল সে।

ধোঁয়ার মধ্যে আরও অস্পষ্ট হয়ে আসছে ট্রিশ। ছায়া ছায়া দেখা যাচ্ছে এখন।

কাশি থামাতে পারছে না কিশোর। চোখে যেন মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'গুড-বাই, কিশোর,' বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে ঘুরতে শুরু করল ট্রিশ।

দরজার দিকে দৌড় মারল কিশোর।

দেখে ফেলল ট্রিশ। চিৎকার করে ধরতে এল কিশোরকে।

সাঁৎ করে সরে গেল কিশোর।

তাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ট্রিশ। পা বেধে গেল উল্টে পড়ে থাকা চেয়ারটায়। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে একেবারে আগুনের মধ্যে। মেঝেতে পড়ল দড়াম করে। মাঝপথে চিৎকারটা থেমে গেল ট্রিশের।

ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু এত বেশি আগুন, কাছেও যেতে পারল না। সমানে কাশছে। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। আর কোন আশা নেই। ট্রিশ শেষ হয়ে গেছে। খারাপ লাগল কিশোরের। কিন্তু কি করবে? নিজের এ পরিণতির জন্যে ট্রিশ নিজেই দায়ী।

আর অপেক্ষা করলে কিশোরও মরবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

এরিক আর বেকিকে চোখে পড়ল। বনের দিক থেকে দৌড়ে আসছে।

কাছে চলে এল ওরা।

'কি হয়েছে, কিশোর ভাই?' এরিক জিজ্ঞেস করল। 'আগুন লাগল কি ভাবে?'

'ট্রিশ আপু কোথায়?' জানতে চাইল বেকি।

জবাব না দিয়ে দু'জনের হাত চেপে ধরে দৌড় মারল কিশোর। আগুনের প্রচণ্ড আঁচ লাগছে গায়ে।

নিরাপদ জায়গায় এসে ফিরে তাকাল কিশোর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চালার ওপর উঠে গেছে আগুন। দরজার ফাঁক দিয়েও বেরিয়ে আসছে লেলিহান শিখা।

ধসে পড়তে শুরু করল ঘরের কড়িকাঠ, চালা। ভাঙা চালার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুন।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ট্রিশ শেষ! আবার ভাবল সে। নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকাল সে।

'গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল পুলিশের গাড়ি।

চব্বিশ

চেয়ে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলেন ডক্টর মানরো। দুই হাতের তালু দৃঢ়বদ্ধ। 'তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিতে চাই, কিশোর পাশা।' তীক্ষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ করে যাচ্ছে কিশোরের। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে

'নতুন আর কি বলব?' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল কিশোর। কাঁধ চুলকাল। 'এই ইউনিফর্মগুলো অতি জঘন্য! এত বেশি মাড় দেয়া। খালি চুলকায়...'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে কেন অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ, জানো তো?'

বিরক্তি ফুটল কিশোরের চেহারায়। 'জানি। ওরাও আর সবারই মত। আমার কথা এক বর্ণ বিশ্বাস করেনি কেউ।'

'বিশ্বাস ওরা ঠিকই করেছিল, পুড়ে মারা গেছে ট্রিশ,' কিশোরের চোখে চোখ রেখে বলতে লাগলেন ডাক্তার। 'তারপর চোখে পড়ল মাথার ক্ষতটা। প্রথমে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছিল, তারপর ঠেলে দেয়া হয়েছিল আগুনের মধ্যে। পুলিশের তখন সন্দেহ হলো, ওকে আগে বাড়ি মেরে খুন করেছ তুমি, তারপর সেটা লুকানোর জন্যে বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। যাতে ঘটনাটাকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট মনে হয়।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ফুলদানী দিয়ে বাড়ি মেরেছি, এটা ঠিক, কিন্তু তাতে মারা যায়নি ট্রিশ। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল কেবল। তারপর আবার উঠেছে। সেটা কটেজে থাকতেই। শেষমেষ শোফারের ঘরে আমাকে মারতে গিয়ে চেয়ারে পা বেধে উল্টে পড়েছিল আগুনের মধ্যে। এমন জায়গায়, ওকে বাঁচানোর কোন উপায়ই ছিল না আমার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে, 'কিশোর, তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। তোমার বন্ধু রবিন আর মুসার জ্ঞান ফিরেছে। মুসাকে রকি বীচে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালের গাড়িতে করে। দু'জনেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে। তাদের কথার সঙ্গে মিলে গেছে তোমার কথা। টবি নামে যে ছেলেটা জজ বুনসন সাহেবের বাড়ির পাশে থাকে, সে-ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে। ট্রিশের কথা জানিয়েছে।...যা-ই বলো, ট্রিশের ক্ষমতাটা কিন্তু বিস্ময়কর। মানুষের এ রকম ক্ষমতা জন্মাতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন।'

আবার একটা মুহূর্ত নীরব থাকার পর ডাক্তার বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে, তুমি নির্দোষ। তোমাকে ছেড়ে দেয়ার অর্ডার সকালেই পেয়েছি। তবু শেষবারের মত আরেকবার কথা বলে নিলাম তোমার সঙ্গে, সত্যটা যাচাইয়ের জন্যে।...একটা কথা শুনলে চমকে যাবে।'

কৌতূহল ফুটল কিশোরের চোখে। সামনে ঝুঁকে এল, 'কি কথা?'

'ওর নাম ট্রিশ নয়। লীলা।'

চমকাল না কিশোর। চেয়ারে হেলান দিল আবার। 'এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কোমার মধ্যে থেকে পালাল কি ভাবে।'

'আমি খানিকটা পারছি,' ডাক্তার বললেন। 'আমাজনের জঙ্গলে গিয়েছিলাম একবার। আদিবাসীদের ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করতে দেখেছি

ওখানে। মৃত জানোয়ারের প্রেতাত্মাকে ডেকে এনে মিডিয়ামের দেহে প্রবেশ করাতে দেখেছি। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত তখন মিডিয়াম।...বিশ্বাস করছ আমার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'করছি। কারণ নিজের চোখেই দেখেছি ট্রিশের ক্ষমতা। কিন্তু তার দেহে আবার কোন্ জানোয়ারের প্রেতাত্মা প্রবেশ করল?'

'ও ট্রিশ নয়, লীলা,' শুধরে দিলেন ডাক্তার। 'লীলার দেহে ট্রিশের প্রেতাত্মা ঢুকেছিল। এ সব খোলাখুলি বলতে গেলে তোমার মতই আমাকেও পাগল ভেবে পাগলা গারদে ভরে দেয়া হবে। তোমাকে বলতে ভরসা পাচ্ছি, কারণ তুমি নিজের চোখে দেখেছ লীলার ক্ষমতা।'

'দেখেছি। আপনার কথা সে-জন্যেই বিশ্বাস করলাম আমিও। কিন্তু ট্রিশটা কে?'

'লীলার বিড়াল,' ডাক্তার জানালেন। 'ওদের বাড়িতে ছবির অ্যালবামে একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ পেয়েছে পুলিশ। তাতে লীলার বাবা-মা, লীলা আর তার পোষা বিড়ালটার ছবি আছে। শুধু বিড়ালটারও ক্লোজআপ ছবি পাওয়া গেছে অ্যালবামে। নিচে নাম লেখা: ট্রিশ।'

*

কিশোরের মনে হতে লাগল, জড়িয়ে ধরার যেন শেষ হবে না আর। হাসপাতালের ওয়েইটিং রুমে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন রাশেদ পাশা, মেরিচাচী, এরিক আর বেকি। সে বেরোতেই উঠে এসে দু'দিক থেকে তাকে আঁকড়ে ধরল ছেলে-মেয়ে দুটো। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাও উঠে এলেন।

কি সাংঘাতিক একটা পুনর্মিলন!

ওর কথা বিশ্বাস করেনি বলে বার বার মাপ চাইতে লাগলেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। মাপ চাওয়া যখন থামল, কাঁদতে শুরু করলেন মেরিচাচী। একবার হাসেন একবার কাঁদেন, জড়িয়ে ধরেন কিশোরকে।

বাইরের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা। তাজা বাতাসে বুক ভরে দম নিল কিশোর। পার্কিং লটে রাখা ওদের গাড়িটাতে গিয়ে উঠল। গ্যারেজ থেকে মেরামত করিয়ে আনা হয়েছে গাড়িটা।

'কোথায় যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাড়ি চলে যাব। রকি বীচে,' জবাব দিলেন চাচা। 'ওই কটেজটাতে ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করছে না এখন।'

'কিন্তু আমার যে করছে। চলো না, বাড়ি যাওয়ার আগে আরেকবার কটেজটায় ঘুরে আসি?'

আপত্তি করলেন না রাশেদ পাশা।

কটেজের গেটের কাছে এনে গাড়ি থামালেন তিনি।

গাড়ি থেকে নেমে এসে শোফারের পোড়া ঘরটার সামনে দাঁড়াল কিশোর। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ঘরটা। কিছু পোড়া ছাই আর কড়ি-বরগার কাঠ বাদে কিছুই নেই। কিশোরের মনে হতে লাগল, এই বুঝি ছাইয়ের নিচ

থেকে লাফ দিয়ে উঠে আসে ট্রিশ। ভয়ঙ্কর হাসি হেসে বলে: এবার মরতে হবে তোমাকে, কিশোর পাশা!

কড়া রোদের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। আর দাঁড়াতে সাহস পেল না। পায়ে পায়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠল।

'কি, যাব এখন?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'হ্যাঁ, চলো,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

গাড়ি ঘোরালেন রাশেদ পাশা।

ফিরে তাকাল কিশোর। পোড়া ঘরটার দিকে। আশা করেছিল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে ট্রিশকে।

কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অকালে এভাবে মেয়েটা মারা না গেলেই ভাল হত।

-: শেষ :-